পবিত্র মদীনার সচিত্র ইতিহাস

সর্বাধুনিক তথ্য ও চিত্র সম্বলিত

শেখ সফিউর রহমান মোবারকপুরী সংকলিত

মুহাম্মদ ওহীদুল আলম অনূদিত

মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত

পবিত্র মদীনার সচিত্র ইতিহাস

মূল আরবী :
শেখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী'র
নেতৃত্বে একদল গবেষক কর্তৃক সংকলিত

ইংরেজি অনুবাদ :
নাসিরুদ্দিন আল-খাত্তাব

বঙ্গানুবাদ :
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

সম্পাদনায় :
মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

চট্টগ্রাম

মাসিক দ্বীন দুনিয়া অফিস
বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স
ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম-৪১০০
ফোন ঃ ২৫১১৩৬৬, ০১১৯৯-২৭০৪৮৫

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী
ধনিয়ালাপাড়া, ডি.টি. রোড
চট্টগ্রাম-৪১০০, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৭২১০৯৯, ৭২৪২৪৩

পাঠক বন্ধু লাইব্রেরী
আন্দরকিল্লা,
চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন ঃ ০১৮৮ ৬৭২৫৪৫

ঢাকা

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী
১৪৯/এ, নিউ এয়ারপোর্ট রোড
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ৯১১৭০৯৪, ০১৮৯-১২৭০০৫

মদিনা পাবলিকেশান্স
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭১৩৪৮, ৭১১৪৫৫৫, ৭১১৯২৩৫

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩২১৭৫৮

পবিত্র মদীনার সচিত্র ইতিহাস

মূল আরবী :
শেখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী

ইংরেজী অনুবাদ :
নাসিরুদ্দিন আল-খাত্তাব

বঙ্গানুবাদ :
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

সম্পাদনায় :
মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্

সহযোগিতায় :
মোহাম্মদ আবদুল হাই
পাম ভিউ ভবন, ১০০এ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।
ফোন : ৭১৪৮০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দারুস্‌সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব।

প্রকাশনায় :
মাসিক দ্বীন দুনিয়া
বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ধনিয়ালাপাড়া, ডি.টি. রোড, চট্টগ্রাম-৪১০০, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১১৯৯-২৭০৪৮৫, ০১৮২২-৫৩৫৯৯৫

প্রকাশকাল :
২২ এপ্রিল ২০০৫ ইংরেজি
৪র্থ মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১২ইং

দাম :
আর্ট পেপারে সম্পূর্ণ রঙিন ছাপা ১২০ টাকা মাত্র

ডিজাইন ও মুদ্রণে :
বায়তুশ শরফ কম্পিউটার এন্ড অফসেট প্রিন্টার্স
ধনিয়ালাপাড়া, ডি.টি. রোড, চট্টগ্রাম-৪১০০, বাংলাদেশ।
ফোন : ০৩১-২৫১১৩৬৬, ৬৩৫৫০৫ (বাসা) মোবাইল : ০১১৯৯-২৭০৪৮৫

উৎসর্গ

'পবিত্র মদীনার সচিত্র ইতিহাস' নামক গ্রন্থটি আমাদের পীর-মুর্শিদ আমৃত্যু সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গবেষণাকর্মের পৃষ্ঠপোষক, দয়ার সাগর ও কর্মবীর বায়তুশ শরফের মহান রূপকার আশিক-এ-রাসূল (সাঃ) হাদিয়ে জামান শাহ্ সূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহঃ) এর মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে উৎসর্গ করছি।

–সম্পাদক
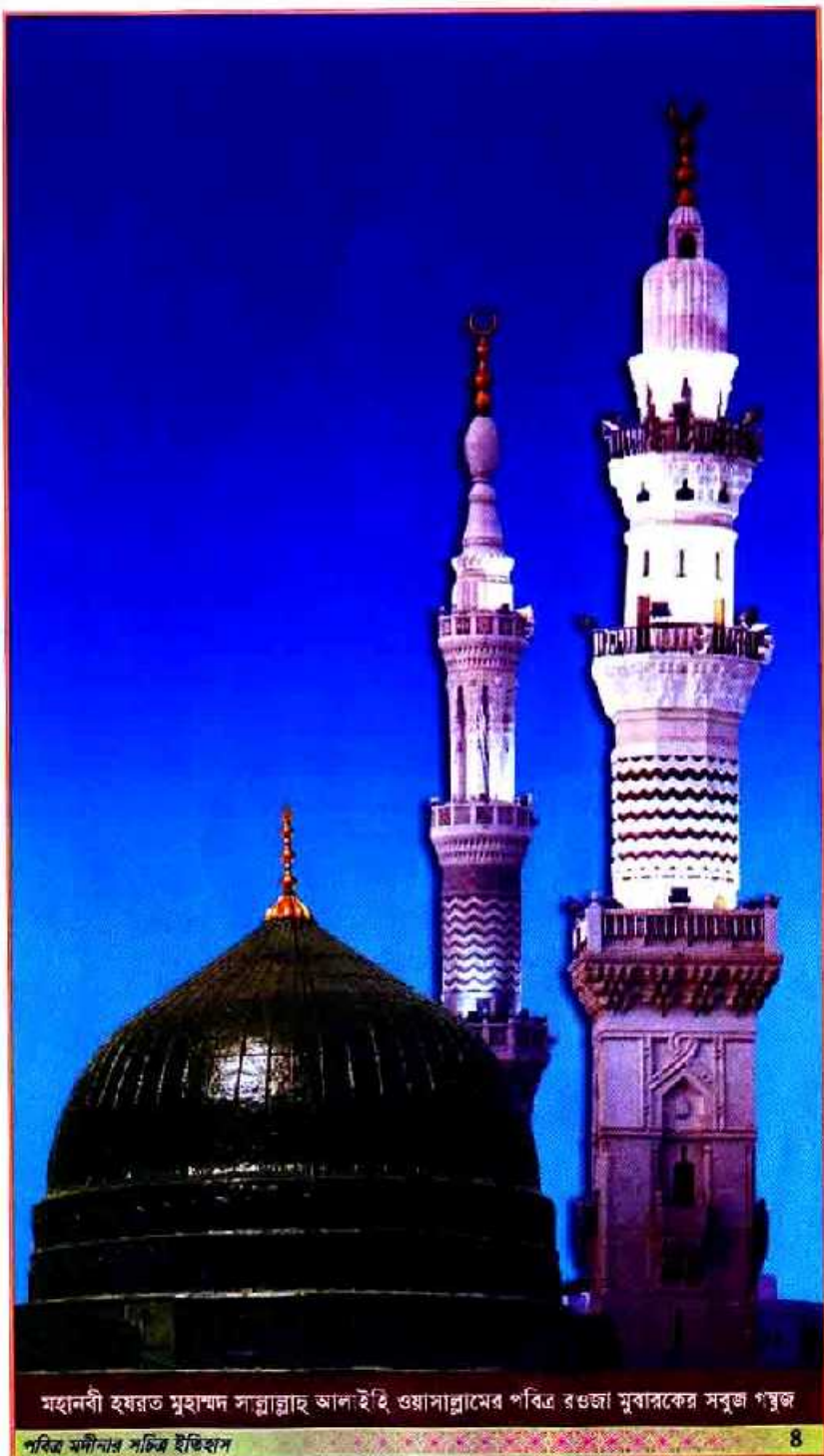
মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজা মুবারকের সবুজ গম্বুজ

অভিমত

مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا + محمدؐ کا روضہ ہے جنت کا نقشہ

মদীনা না দেখা তো কুছভী না দেখা

মুহাম্মদ কা (সঃ) রওজা জান্নাত কা নকশা

আমি জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ এর মুখপত্র চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী পত্রিকা 'মাসিক দ্বীন দুনিয়া'র সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্'র সম্পাদনায় "পবিত্র মদীনার সচিত্র ইতিহাস" নামক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। *History of Madinah Munawwarah* নামক ইংরেজী গ্রন্থটি তিনি এবার আমার সাথে পবিত্র হজ্ব পালনের সময় মক্কা শরীফ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন।

অনুবাদক জনাব মুহাম্মদ ওহীদুল আলম অত্যন্ত যত্নের সাথে গ্রন্থটি অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষী অগণিত পাঠকের চাহিদা পূরণে যথার্থ ভূমিকা পালন করেছেন।

আসন্ন পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) কে সামনে রেখে গ্রন্থটির প্রকাশনা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মহান আল্লাহ্ মূল লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত মদীনা শরীফের ইতিহাস রচনা ও প্রকাশনার বিনিময়ে এ দুনিয়ায় উন্নতি ও আখেরাতে জান্নাত নসীব করুন- এই দোয়া করছি। আমীন।

মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন

(মাওলানা) মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন
পীর ছাহেব, বায়তুশ শরফ ও
সভাপতি
বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম
তারিখ : ৭ই এপ্রিল ২০০৫ ইং

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি যিনি আপন রহমত ও হেকমতের মাধ্যমে মানুষ তথা সকল সৃষ্টিকে এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উন্নীত করেন। সেই মহান স্রষ্টার শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি, নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হিস্ সালামের প্রতি অশেষ দরূদ ও সালাম যিনি আল্লাহর বাণীকে মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পবিত্র জিন্দেগীর প্রতিটি মুহূর্তকে উৎসর্গ করেছেন।

মদীনা শরীফ পৃথিবীপৃষ্ঠে এমন একটি অনন্য শহর যা আল্লাহর নবীকে ধারন করে আছে। এ পবিত্র শহরটি প্রতিটি ঈমানদার মুসলমান নর-নারীর ঈমান ও আবেগকে যুগে যুগে আবিষ্ট করে রেখেছে। মদীনার আহবান এক আকর্ষণীয় মোহনীয় সুরের ন্যায় প্রতিটি মানুষের অন্তরকে বিগলিত ও মথিত করে তোলে। এ শহর থেকেই মানুষের মুক্তির পয়গাম দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সত্যের প্রতিষ্ঠায় ও মিথ্যার প্রতিরোধে, তওহীদের আলোর প্রকাশ ও বিকাশে, কুফরীর অন্ধকার অপসারণে এ শহর থেকেই শুরু হয়েছিল সর্বাত্মক লড়াই। নানাবিধ স্বার্থ সংঘাতে জর্জরিত মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে এ শহর থেকেই ঘোষিত হয়েছিল ঐতিহাসিক মদীনা সনদ। জাতিগত সংঘাতের মূলোৎপাটন, সুদের উচ্ছেদ, দাস প্রথার বিলুপ্তি ও পালনবাদী অর্থনীতি (রবূবিয়াত) ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব এ শহরকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল।

সেই শহরের কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে এ ক্ষুদ্র ইতিহাস পুস্তিকা। তবে স্বীকার করতে বাধা নেই এটা কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ নয়। মানুষের জানার আগ্রহকে উজ্জীবিত করার প্রয়াসে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ 'আর রাহীকুল মাখতুম' নামক সুপ্রসিদ্ধ সীরাত গ্রন্থের প্রণেতা সফিউর রহমান মুবারকপুরীর তত্ত্বাবধানে একদল বিশেষজ্ঞ এ পুস্তকটি রচনা করেছেন।

আমি এর ভাষান্তর করেছি মাত্র। তবে দু'একটি যায়গায় সাধারণ বিবেচনা বোধকে কাজে লাগাতে হয়েছে। প্রায় আকস্মিক ভাবেই আমাকে এই অনুবাদে হাত দিতে হয়েছে। বন্ধুবর মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ ভাইয়ের অনুরোধ ছিল অকৃত্রিম, আর আমার হাতে সময় ছিল স্বল্প। শারীরিক অসুস্থতা, সংসার ও অফিসের কাজের মাঝে মাত্র ২০ দিনেরও কম সময়ে আমাকে এ অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন করতে হয়েছে। অবশ্য পরে সম্পাদনা করতে যেয়ে জাফর উল্লাহ ভাই এর উৎকর্ষ সাধনে, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে যথেষ্ট শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন।

তবুও এ পুস্তকের অনুবাদের ভুল ত্রুটির জন্য আমি মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী।

"নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত।" -আল-কোরআন।

মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

ধলই (মাইঝপাড়া)

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

০৪.০৪.২০০৫ ঈঃ

এই অনুবাদকের প্রকাশিত বই

১. দি ডাচেস অব মালফি- জন ওয়েবস্টার

২. রুশদী-প্রিন্সিপ্যাল এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরী

৩. আল-কোরআন : চূড়ান্ত মো'জেযা-আহমদ দীদাত

সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ

ওয়ালিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম।

প্রতিটি ঈমানদার মুসলমানের আত্মা মিশে আছে নবীজীর শহর মদীনা শরীফের সাথে যেখানে শায়িত আছেন স্বয়ং সরওয়ারে কায়েনাত, নূরে মুজাস্সম, রাসূলে আকরাম, শাফিউল মুজনেবীন, নবীয়ে রহমত ও বরকত হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

আলোক প্রত্যাশী প্রতিটি মুমিন মুসলমানের অন্তর আজন্ম উন্মুখ হয়ে থাকে নবীয়ে পাকের রওজা মুবারক জিয়ারতের জন্য। যুগে যুগে দেশে দেশে কত কবি মহাকবি নবীজীর শা'নে কত শত সহস্র হৃদয়মথিত অশ্রুভেজা কবিতা-না'ত রচনা করেছেন তার প্রকৃত হিসেব কেউ কোনদিন দিতে পারবে না। তাঁদের কাব্যকথার মূলসুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে নবীজী ও নবীজীর শহর মদীনা শরীফকে নিয়ে।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কতইনা দরদ দিয়ে গেয়েছেন পবিত্র মদীনার গান :-

ভেসে যায় হৃদয় আমার মদীনার পানে
হিজরত করে আসিলেন নবী প্রথম যেখানে।।

লাখো আউলিয়া আম্বিয়া বাদ্শাহ্ ফকির
যেথা যুগে যুগে আসি করিল যে ভিড়
তার ধুলাতে লুটাবো আমি লোয়াব আমার শির
নিশিদিন শুনি তারি ডাক প্রভু- আমার এ পরাণে।।

হুজুরে পাক (সাঃ) এর রওজা মোবারকের সবুজ গম্বুজ তো বেহেশ্তেরই একটি নিদর্শন যা দর্শনে শুধু চক্ষুই পবিত্র হয়না, অন্তরও প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। যে গম্বুজের চতুর্দিক দিয়ে রহমতের স্রোতধারা সদা প্রবাহমান সেই ঝর্ণার প্রস্রবনে কার না অবগাহন করতে ইচ্ছে করে! কার না ইচ্ছে করে মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামায পড়তে! কার না মন চায় হৃদয় উজাড় করে বাদ্শাহ্র বাদ্শাহ্ কমলিওয়ালার রওজা পাকে দাঁড়িয়ে তাঁরই মহান দরবারে সরাসরি সালাম জানাতে!

বছরের পর বছর হৃদয়ের মণিকোঠায় লুকিয়ে রাখা আমার সে স্বপ্ন-সাধ আল্লাহ্ পাক সুবহানাহু তা'আলা পূরণ করলেন এবার। বায়তুশ শরফের মহানুভব পীর বাহরুল উলুম শাহ্ সূফী আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন ছাহেব (ম.জি.আ.) এর আন্তরিক অনুপ্রেরণা ও দোয়ায়, মাসিক দ্বীন-দুনিয়ার মাননীয় সম্পাদক আমার লিখনী বিষয়ক প্রতিটি কাজের প্রেরণাদাতা আলহাজ্ব মাওলানা এ. কে. মাহমুদুল হক এবং বায়তুশ শরফ আন্জুমনে ইত্তেহাদের অন্যতম সহ-সভাপতি আমার সাহিত্য সাধনা ও ব্যক্তি জীবনে আনন্দ-বেদনার শরীকদার শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব মোহাম্মদ শামসুল হক ছাহেবের অকৃত্রিম উৎসাহে দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্ আমাকে হজ্বে যাবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

কূল-কিনারা বিহীন অথৈ সাগরে বিক্ষিপ্তভাবে ভেসে বেড়ানো শেওলাকে মহান আল্লাহ্ যেন স্বহস্তে তুলে নিয়ে সিজদাবনত করিয়েছেন কাবার চত্বরে, কাবার দরজায়, মাকামে ইব্রাহীমে, হাতিমে, উম্মেহানিতে, রিয়াজুল জান্নাতে, হাজরে আসওয়াদের চুমুতে, সাফা-মারওয়ার সা'য়ীতে, বিনীত মিনতি জানানোর জন্য দাঁড় করিয়েছেন রওজায়ে র'সূলে পাক (সঃ) এ। দু'চোখ ভরে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন মক্কা, মদীনা, মীনা, আরাফাত, মুজদালিফা; সুযোগ হয়েছে দেখা ও মেলামেশার বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্র সাথে। শোকর আলহামদুলিল্লাহ্।

সে সফরে গিয়েই পবিত্র কাবা শরীফের আন-নদ্ওয়া প্রবেশদ্বারের সম্মুখস্থ আল-শামিয়া এলাকার একটি লাইব্রেরী হতে সংগ্রহ করেছি পবিত্র মক্কা ও মদীনা নগরীর ইতিহাসসহ বেশ কিছু অতি মূল্যবান গ্রন্থ। তন্মধ্যে আমার মুসলমান ভাই-বোনদের কাছে সর্বপ্রথম উপস্থাপন করছি "পবিত্র মদীনার সচিত্র ইতিহাস" নামক ইংরেজী গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ; যা পাঠে পবিত্র মদীনার আদি ও বর্তমান ইতিহাস সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকা বৃন্দ সচিত্র সম্যক ধারণা লাভে ধন্য হবেন।

যাঁরা পবিত্র হজ্ব ও ওমরাহ পালনের ইচ্ছে পোষণ করছেন অথবা যাঁরা ইতোপূর্বে মক্কা ও মদীনা শরীফ যিয়ারত করেছেন তাঁদের সবার জন্যই এটি অত্যন্ত সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে প্রতিভাত হবে। আর যাঁরা মদীনা শরীফের ইতিহাস জানার জন্য বইটি পাঠ করবেন তাঁদের মানসপটে ভেসে উঠবে পবিত্র মদীনার অতীত ও বর্তমানকালের সচল ছবি। ইনশাআল্লাহ এ গ্রন্থ পাঠে তাঁরা নিজেদের ধন্য মনে করবেন। তাঁদের হৃদয়-মন ছুটে যাবে সোনার মদীনায় নবীজীর পবিত্র রওজা মুবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে।

বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও অনুবাদক জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ ওহীদুল আলম অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে এর অনুবাদকর্ম সুসম্পন্ন করেছেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ এ সহযোগিতা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহান আল্লাহ্ তাঁকে ধর্ম, কর্ম ও পারিবারিক জীবনে অসামান্য সাফল্য দান করুন। দ্বীনের খেদমতে তাঁকে চিরকাল নিয়োজিত রাখুন।

পরম শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব মাওলানা এ. কে. মাহমুদুল হক তাঁর শত ব্যস্ততা উপেক্ষা করে পাণ্ডুলিপিটির সংশোধন ও পরিমার্জনে যে মূল্যবান পরামর্শ ও সময় দান করেছেন রাব্বুল আলামীন তাঁকে এর নেয়া'মুল বদল দান করুন।

এই পবিত্র গ্রন্থটির বিক্রয় লব্ধ অর্থ যুগে যুগে মাসিক দ্বীন-দুনিয়া এবং শিশু কিশোর দ্বীন-দুনিয়া 'পত্রিকা-তহবিলে' জমা হতে থাকবে। সঞ্চিত তহবিল দিয়েই পরবর্তী সংস্করণগুলো সম্পন্ন করা হবে।

বইটি নির্ভুল করার জন্য আমাদের আন্তরিকতার কোন ত্রুটি ছিলনা। তবুও অনিচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি পরিদৃষ্ট হলে তা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেব।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্পাকের দয়ায় অচিরেই আমরা 'পবিত্র মক্কার সচিত্র ইতিহাস' (*History of Makkah Al Mukarramah*) গ্রন্থটি পাঠকদের হাতে তুলে দেবার আশা রাখি। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লাহ্‌বিল্লাহ্। আল্লাহ্ হাফেজ।

মাওলানা রেজাউল হক সাহেবের বাড়ি
গ্রাম- রাসূলপুর (দেবরামপুর,পূর্ব প্রান্ত)
ডাকঘর- ইয়াকুব পুর, উপজেলা- দাগনভূঞা
জেলা- ফেনী, বাংলাদেশ।

মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্
বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স
ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম।
তারিখ ঃ ১০/০৪/২০০৫ইং

সূচিপত্র

মদীনা মুনাওয়ারা-নামকরণ ও আদি ইতিহাস

ইয়াসরিবের প্রতিষ্ঠা

আরবীয় সূত্রগুলো এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করে যে হযরত নূহ (আঃ) এর এক অধঃস্তন পুরুষের নাম ছিল ইয়াসরিব, যিনি এ শহরের গোড়াপত্তন করেন। প্রতিষ্ঠাতার নামেই এর নামকরণ করা হয় ইয়াসরিব।

এখানে বসতি স্থাপনের কারণ হিসেবে বর্ণিত আছে যে, মহাপ্লাবনের পর হযরত নূহ (আঃ) এর কোন কোন সন্তান আশেপাশে বসবাসের উপযোগী স্থান না পেয়ে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হন। উদ্দেশ্য ছিল জীবন ধারণের উপকরণসমূহ সহজলভ্য হয় এমন অঞ্চল খুঁজে বের করা। এদেরই একটি দল, যারা উবাইল নামে পরিচিত ছিল, তাঁরা ইয়াসরিবে এসে পৌঁছে। এখানকার পরিবেশ তাঁদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট করে। কারণ এখানে ছিল পর্যাপ্ত পানি, সবুজ গাছপালা এবং প্রাকৃতিক সুরক্ষা বেষ্টনি সৃষ্টিকারী শৈল শ্রেণী।

ইয়াসরিবের আদি অধিবাসী

ইয়াসরিবের আদি অধিবাসীদের মধ্যে ছিল তিনটি বৃহৎ গোত্র :

১. আমালিকা গোত্র

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে এ গোত্রের হাতেই ইয়াসরিবের গোড়াপত্তন। তাঁরা ছিল উবাইল গোত্র; উবাইল থেকে এসেছেন ইয়াসরিব। তাঁর নামেই এ শহরের নামকরণ। তিনি ছিলেন আমালিকা গোত্রভূক্ত। এ নাম থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁরা দৈহিক উচ্চতায় খুব আকর্ষণীয় ছিলেন [1] তাদের বংশ ধারা নিম্নরূপ ঃ

আমালিক বিন লউদ বিন শেম বিন নূহ (আঃ)। তাঁরা প্রথমে বসতি গড়েন বেবিলনে (ইরাকে)। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েন আরব উপসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাঁদেরই কেউ কেউ আবাস গড়েন ইয়াসরিবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁরা সবাই ছিল আরব। ইমাম আত তাবারীর মতে তাঁদের পূর্ব পুরুষ আমালিকই হচ্ছেন প্রথম আরবী-ভাষী।

২. ইহুদী

মুসলমানরা যখন ইয়াসরিবে হিজরত করেন তখন তাঁরা সেখানে কয়েকটি ইহুদী সম্প্রদায়কে দেখতে পান। ইয়াসরিবের ইহুদীরা প্যালেস্টাইন হতে আগত মুহাজিরদের উত্তর পুরুষ। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মাঝে ঐকমত্য রয়েছে। বুখতে নসরের সময়ে এদের কয়েকটি গোত্র এখানে হিজরত করে। বুখতে নসর জুদাহ সম্রাজ্যকে মিসমার করে দেন, অনেক ইহুদীকে হত্যা করেন এবং তাদের অনেককে দাসে পরিণত করেন। এটি ঘটেছিল খৃষ্টীয় গণনা সাল শুরু হবার ৫৮৬ বছর পূর্বে। রোমানদের আমলেও অনুরূপভাবে ইহুদীদের ব্যাপকভাবে দেশত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল। একবার ৭০ সালে, দ্বিতীয়বার ১৩২ সালে। দেশত্যাগী ইহুদীদের কিছু অংশ ইয়াসরিবে বসতি স্থাপন করে। প্রথম দিকে যারা এখানে বসতি স্থাপন করে তাদের মধ্যে বনু কোরায়জা ও বনু নাযির ছিল প্রধান। পরে অন্যান্য গোত্র তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

এরা কাহতান গোত্রের লোক। সাদ মা'আরিবের ধ্বংস শেষে তারা ইয়েমেন হতে ইয়াসরিবে আগমন করে। ইয়াসরিবে তাদের বসতি স্থাপন ইতিহাসে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশুদ্ধ সূত্র মতে তারা খৃষ্টীয় ৩য় সনে মদীনায় বসতি স্থাপন করে।

মদীনা মুনাওয়ারার নামসমূহ :

আল্লাহর নবীর (সাঃ) শহর যুগে যুগে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়ে আসছে। এর বিপুল সংখ্যক নাম এ শহরের গুরুত্ব ও মহত্বের ইঙ্গিতবাহী। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল :

আল মদীনা :

আল মদীনা রাসূলে করীম (সাঃ) এর হিজরতের বিখ্যাত শহর। এখানেই তিনি শায়িত আছেন

তাবাহ :

মদীনা তাবাহ নামে পরিচিত। আল্লাহর হাবীব (সাঃ) বলেছেন : "নিশ্চয়ই মহান সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ এদের তাবাহ নামকরণ করেছেন।" তাবাহ এবং তাইয়েবা শব্দদ্বয় এসেছে আত-তাইয়্যিব থেকে। কারণ এটি শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর প্রত্যেক বিশুদ্ধ জিনিসই তাইয়্যিব বা উত্তম।

ইয়াসরিব :

এ শহরের আদি নাম ইয়াসরিব। ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর প্রতিষ্ঠাতার নামেই এ শহরের নামকরণ করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হিজরতের পর এর নাম পাল্টিয়ে মদীনা রাখেন। এর একটি সূক্ষ্ম কারণ এ হতে পারে যে আরবীতে তাসরিব শব্দের অর্থ অপবাদ। এর আর এক অর্থ যা দূষিত বা অশুদ্ধ করে ফেলে। সহিহাইন (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)[৫] এর বর্ণনা মতে হযরত আবু মূসা (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন :

"আমি স্বপ্নে দেখলাম যে মক্কা নগরী হতে খেজুর বৃক্ষ সম্বলিত একটি দেশে আমি হিজরত করেছি। আমি অনুমান করলাম এটি ইয়ামামা বা হাজার হতে পারে কিন্তু বাস্তবে তা ছিল ইয়াসরিব শহর।"[৬]

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) বলেন, "ইয়াসরিব সমগ্র অঞ্চলের নাম এবং আল্লাহর নবীর শহর এর একটি অংশ মাত্র।"

ইয়াকুত আল হামাবি তাঁর 'মুজমাউল বুলদান' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, "এ শহরের ২৯ টি নাম রয়েছে, যেমন : আল-মদীনা, আল-তাইয়্যেব, আল-তাবাহ, আল-মিসকিনা, আল-আযরা, আল জাবিরাহ, আল মুহাব্বা, আল মুহাব্বাবাহ, আল মাহবুরাহ, ইয়াসরিব, আল নাজিয়াহ, আল মুফিয়া, আকালাতুল বুলদান, আল-মুবারাকাহ, আল-মাহফুফাহ, আল-মুসাল্লামাহ, আল-মিজান্নাহ, আল-কুদসিয়া, আল-আসিমাহ, আল-মারজুকা, আল-শাফিয়া, আল-খীরা, আল-মাহবুবা, আল-মারহুমাহ, জাবিরাহ, আল-মুখতারাহ, আল-মুহাররামাহ, আল-কাসিমা, আল-তাবাহ।"

মহান আল্লাহর আয়াত উদ্ধৃত করে রাসূলে মকবুল (সাঃ) বলেন :

রাব্বি আদ্‌খিলনি মুদখালা ছিদ্‌কিন ওয়াআখরিজনি মুখরাজা ছিদ্‌কিন।

"হে আমার প্রভু! কল্যাণের সাথে (এ শহরে) আমাকে প্রবেশ করাও এবং (অনুরূপ) কল্যাণের সাথে আমাকে (এ শহর থেকে) নিস্ক্রান্ত কর।" *(সূরা বনি ইসরাঈল: ৮০)*

বিজ্ঞজনেরা বলেন : "(শহর দুটি হচ্ছে) আল মদীনা এবং মক্কা।"[৭]

মদীনা মুনাওয়ারার ফজিলত

মদীনা শরীফের ফজিলত অসংখ্য, এর বৈশিষ্ট্য অগণিত। মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব এর মর্যাদাকে উচ্চকিত করেছেন। পবিত্র হাদিস শরীফে এবং নেককার সাহাবাগণের বর্ণনায় এ শহরের মর্যাদা ও ফজিলত নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। রাসূলে করীম (সাঃ) এর হাদিস ও মুনাজাতে এ দলীল আছে যে, মদীনা শরীফে ইহকাল পরকাল উভয় কালের কল্যাণ নিহিত আছে। হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেছেন, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেন :

"হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের কাছে প্রিয় কর, যে ভাবে আমরা মক্কাকে ভালবাসি; কিংবা করো তার চেয়েও প্রিয়তর। হে আল্লাহ! এ শহরকে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী করে দাও এবং এর ছা' এবং মুদ্দ' কে আমাদের জন্য কল্যাণকর কর এবং এর জ্বর-ব্যাধিকে জুহফায় নির্বাসিত কর।"[১০]

মহান আল্লাহ তাঁর পিয়ারা হাবীবের (সাঃ) এ প্রার্থনা কবুল করেছেন। এ প্রার্থনার বরকতে মদীনাকে সুরক্ষিত রেখেছেন, এখানকার জীবন যাত্রাকে করেছেন বরকতময়। সারা দুনিয়ায় মদীনা এখনো পর্যন্ত সর্বাধিক প্রিয়তম জনপদের অন্যতম হয়ে আছে প্রতিটি মুমিন মুসলমানের কাছে– একমাত্র প্রিয়তম জনপদ না হলেও। এটি রাসূল (সাঃ) এর মোবারক দোয়ারই ফল। আর কত আকুল ভাবেই না মদীনার জন্য রহমত ভিক্ষা করতেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)!

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন: "হে আল্লাহ! তুমি মক্কার তুলনায় মদীনার ওপর দ্বিগুণ রহমত বর্ষণ কর।"[১১]

সহীহাইনের বর্ণনা মতে হযরত আবদুল্লাহ বিন জায়েদ বিন আসিম (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

"নিশ্চয়ই হযরত ইবরাহিম (আঃ) মক্কাকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন এবং অধিবাসীদের জন্য প্রভুর কাছে বিনীত প্রার্থনা করেছেন। একইভাবে আমিও মদীনাকে অপবিত্রকরণ অযোগ্য (পবিত্র) ঘোষণা করি যেমনভাবে হযরত ইবরাহিম (আঃ) মক্কাকে ঘোষণা করেছেন। এবং আমি আল্লাহর দরবারে মদীনার ছা' ও মু'দে (পরিমাপের দু'একক) দ্বিগুণ বরকত কামনা করি যেমন তিনি মক্কার অধিবাসীদের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন।"[১২]

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলেন, তিনি তাঁর পিতা হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন;

"যখন মদীনার জীবন যাত্রা কঠিন হয়ে পড়ল এবং জিনিসপত্রের মূল্য বেড়ে গেল তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন– হে মদীনাবাসী! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং এ শুভ সংবাদ গ্রহণ কর আমি আল্লাহর সমীপে তোমাদের ছা' ও মু'দে বরকত কামনা করেছি। তোমরা একত্রে আহার কর এবং পৃথক পৃথক হয়োনা, কেননা একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট, দু'জনের খাদ্য চারজনের, চারজনের খাদ্য পাঁচ অথবা ছয় জনের জন্য যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই জামায়াতের মধ্যে রয়েছে রহমত।"[১৩]

এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদিসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন :

প্রথম শস্য উৎপাদিত হলে লোকজন তা মহানবী (সাঃ) এর সমীপে নিয়ে আসত। তিনি তা হাতে নিয়ে বলতেন : 'হে আল্লাহ! আমাদের শহরকে বরকতময় কর, বরকতময় কর আমাদের ছা এবং মুদ্দকে। অবশ্যই হযরত ইবরাহিম (আঃ) তোমার বান্দা ও খলীল[১৪] এবং নবী, তিনি মক্কার জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করেছেন, আমিও মদীনার (বরকতের) জন্য প্রার্থনা করি যেমন তিনি মক্কার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং অনুরূপ আরারও।' অতপর তিনি

সেখানে উপস্থিত সর্বকনিষ্ঠ বালককে অগ্রে ডাকতেন ও তা তার হাতে তুলে দিতেন।"[১৭]

এবং ঈমান মদীনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ও এখানেই স্থিত; যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনা মতে হুজুরে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন :

"অবশ্যই ঈমান মদীনাতে ফিরে আসবে যেভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।"[১৬]

যেভাবে সাপ খাদ্যের তালাশে তার গর্ত ছেড়ে বের হয় এবং কোন কিছু যখন তাকে ভীত করে তোলে তখন সে তার গর্তে ফিরে আসে। একই ভাবে ঈমান মদীনা হতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমান নবীজী (সাঃ) এর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার কারণে মদীনা জিয়ারত করার গোপন ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করে। প্রত্যেক কালে ও যুগে এটি ঘটে থাকে। রাসূল (সাঃ) এর যামানায় প্রত্যেকজন শিক্ষার উদ্দেশে মদীনা শরীফ গমন করত। পরবর্তীতে সাহাবা, তাবেয়ীনগণ তাবে-তাবেয়ীন এবং পরবর্তীগণের যামানায় তাদের কাছ থেকে হেদায়েত লাভের উদ্দেশ্যে এবং আরও পরবর্তীতে আল্লাহর নবীর মসজিদে ইবাদতের উদ্দেশ্যে, তাঁর রওজা শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম করার লক্ষ্যে মদীনা জিয়ারতের ইচ্ছে পোষণ করে।

মদীনা শরীফের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বদচরিত্রের লোকদের সে তার বুক থেকে বের করে দেয়। সজ্জনের জন্য এ শহর আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তা সৎলোকের আবাসস্থলও বটে।

হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার একজন বেদুঈন আল্লাহর নবীর (সাঃ) কাছে এসে তার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিল। পরদিন সে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এসে বলল, "আমার আনুগত্যের শপথ ফিরিয়ে নিন।" কিন্তু আল্লাহর নবী (সাঃ) তিন তিনবার তা করতে অস্বীকার করলেন। অতপর বললেন : মদীনা একটা হাপরের (bellows) মত এটা সমস্ত আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং এর আসল বস্তুকে বিশুদ্ধ করে তোলে।"[১৮]

তিনি আরও বলেন :

"নিশ্চয়ই এটি দূষিত বস্তুকে তেমন ভাবে বিদূরিত করে, আগুন যেমন রূপা থেকে খাদকে বিদূরিত করে।"[১৯]

এখানে 'খাদ'কে বলতে পাপীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

আল্লাহ এমন কোন পাপীকে এখান থেকে বহিষ্কার করেন না যার পরিবর্তে একজন উত্তম মানুষকে তার স্থলাভিষিক্ত না করেন। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন:

"মদীনার লোকদের নিকট এমন এক সময় উপস্থিত হবে যখন একজন লোক তার জ্ঞাতি ভাই এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনকে আহবান করবে, "এসো (এবং বসতি স্থাপন কর) এমন এক যায়গায় যেখানে জীবন ধারণ আরামপ্রদ, এসো (এবং বসতি স্থাপন কর) এমন এক যায়গায় যেখানে জীবন ধারণ আরামপ্রদ।" কিন্তু মদীনাই তাদের জন্য উত্তম, যদি তারা জানত। সেই প্রভুর শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যে কেউ এর প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে মদীনা ত্যাগ করে যাবে আল্লাহ তার উত্তরাধিকারীকে (এতে বসবাসকারী) তার চেয়ে উত্তম মর্যাদা দেবেন। জেনে রেখ! মদীনা এক হাপরের মত যে আবর্জনাকে দূরীভূত করে দেয়। হাপর যেভাবে লোহা থেকে অবিশুদ্ধ পদার্থ (মরিচা) অপসারণ করে সেভাবে মদীনা তার বুক থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত মন্দকে নিঃশেষ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হবে না।"[২০]

অবশ্য কেউ যদি যুক্তিসংগত কারণে কিংবা এর প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষের বশবর্তী না হয়ে মদীনা ত্যাগ করে তবে তাতে আপত্তির কিছু নেই। কেননা রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন-

"কেউ নয় যে এর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে মদীনা ত্যাগ করবে ..... "[২১]

আল্লাহর হাবীব (সাঃ) লোকজনকে মদীনায় বসবাসের জন্য বরাবরই উৎসাহ দিয়েছেন। কারণ দুনিয়া ও আখিরাতের কী সব নিয়ামত এখানে রয়েছে তা তিনি ভালভাবেই জানতেন। হযরত সা'দ (রাঃ) এর বর্ণনায় রাসূলে মকবুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন :

"যে কেউ এখানে ক্ষুধার যন্ত্রণা, স্বল্প আয়ের তাড়না ও জীবন ধারণের কষ্ট সহ্য করে থাকবে রোজ হাশরের ময়দানে আমি তার জন্য হব সুপারিশকারী ও সাক্ষ্যদাতা।"[২২]

একজন মদীনাবাসী যদি অন্য কোন পার্থিব বা অপার্থিব কল্যাণ হাসিল নাও করে থাকে তবুও তার জন্য রাসূলে পাক (সাঃ) এর এ ঘোষণাই যথেষ্ট। মদীনার যদি আর কোন ফজিলত নাও থাকে শুধুমাত্র এটিই একজন মানুষের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার। আল্লাহর নবীর (সাঃ) সাহাবাগণ (রাঃ) মদীনায় বসবাসের এ সর্বোত্তম পুরস্কারের কথা অবহিত ছিলেন। তাঁরা এ পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় ধৈর্যসহকারে সকল দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করে গেছেন। যারা মদীনা ত্যাগ করে অন্যত্র বসবাস করতে চাইতো তাঁরা তাদের তা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতেন।

হযরত সাঈদ বিন আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আল-মাহরীর একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আল হাররার (ইমাম হোসাইন রাঃ এর শাহাদাতের পর ইয়াজিদ বাহিনী কর্তৃক মদীনা শরীফে সংঘটিত লোমহর্ষক, নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক ঘটনার) গোলযোগপূর্ণ রাতে হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) এর কাছে হাজির হয়ে মদীনা ত্যাগের বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চাইল। সে মদীনার উচ্চ দ্রব্য মূল্যের ব্যাপারে অভিযোগ তুলে বলল, তার পরিবার বড় এবং প্রতিপাল্যের সংখ্যা বেশি। অতএব সে মদীনায় জীবন ধারণের কষ্ট সহ্য করতে পারছেনা। তা শুনে তিনি জবাব দিলেন, তোমার জন্য দুঃখ! আমি তোমাকে মদীনা ত্যাগ করার পরামর্শ দিতে পারিনা। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, "যে কেউ মদীনায় বসবাসের কষ্ট সহ্য করবে ও এর সীমাবদ্ধতাকে মেনে নেবে তার জন্য হাশরের মাঠে আমি হব সুপারিশকারী ও সাক্ষ্যদাতা, যদি সে মুসলমান হয়।"[২৩]

তিনি আরও বলেছেন, "যার পক্ষে এখানে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হয় সে যেন তাই করে, কারণ যে মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে পুনরুত্থান দিবসে আমি হব তার সুপারিশকারী।"[২৩]

মদীনা শরীফের আরও একটি ফজিলত এই যে, যারা মদীনাবাসীদের জন্য ভীতির কারণ ঘটাবে কিংবা তাদের বিরুদ্ধে বিস্তার করবে ষড়যন্ত্রের জাল, তাদেরকে আল্লাহর হাবীব (সাঃ) নিন্দা করেছেন। সহীহ আল বুখারীতে হযরত আয়িশাহ (রাঃ)-র বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ 'হযরত সা'দ (রাঃ) বলেছেন : "আমি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যারাই মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাবে তারা সেভাবেই গলে যাবে যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়।"

আন নাসাঈ হযরত আস সা'ইব বিন খাল্লাদ (রাঃ) এর জবানীতে বর্ণনা করেছেন- "যে কেউ অত্যাচারের মাধ্যমে মদীনার মানুষদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলবে, আল্লাহ তাকে ভীতিগ্রস্ত করে তুলবেন এবং তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসবে।"[২৪]

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে হযরত আমীর বিন সা'দ (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন :

"যে কেউ মদীনার লোকজনের ক্ষতি করার ইচ্ছে করবে আল্লাহ তাকে এমনভাবে গলিয়ে ফেলবেন যেভাবে সীসা আগুনে গলে যায় কিংবা পানিতে লবণ।"[২৫]

এই বিষয়ে আল্লাহর নবী (সাঃ) এর চূড়ান্ত সতর্কবাণী ব্যক্ত হয়েছে তাঁর নিম্নোক্ত হাদিসে তিনি বলেছেন ঃ যে কেউ মদীনার লোককে ভীতি প্রদর্শন করল সে যেন আমাকেই ভীতি প্রদর্শন করল। এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তার ফরজ কিংবা নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না।

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, 'হযরত নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন :

"যে কেউ মদীনার অধিবাসীদের ভীতিগ্রস্ত করবে তার ওপর আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাকুল এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত। আল্লাহ্ তার কাছ থেকে সার্ফ[২৮] বা আদল[২৯] (বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ) কিছুই গ্রহণ করবেন না।[৩০]

হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণিত আর এক হাদিসে বলা হয়েছে, তিনি বলেছেন : "ধ্বংস হোক সে লোক, যে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) কে ভয় দেখায়।" তাঁর দু'ছেলের একজন বললেন, "হে আমার পিতা! আল্লাহ্র হাবীব (সাঃ) তো ইনতিকাল করমায়েছেন, তাঁকে কীভাবে ভয় দেখানো যেতে পারে?" জবাবে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি :

"যে মদীনার জনগণকে ভয় দেখায় সে আমার দু'পার্শ্বের মধ্যবর্তী যা আছে তাকে (অর্থাৎ আমাকে) ভয় দেখায়।"[৩১]

অন্য এক বর্ণনায় :

যে মদীনার জনগণের জন্য ভীতির কারণ সৃষ্টি করল, সে এ দু'য়ের মধ্যে যা আছে তার জন্য ভীতির কারণ সৃষ্টি করল। – এবং এ বলে আপন দু'মোবারক হাত আপন দু'পাশে স্থাপন করলেন।"[৩২]

মদীনার আরও একটি ফজিলত হচ্ছে এখানে না প্লেগ, না দজ্জাল, কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। এ বিষয়ে কতিপয় সহিহ হাদিস রয়েছে। সহিহাইন (২টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম শরীফ) -এ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন,

"মদীনার প্রবেশ পথে রয়েছে ফিরিশতাদের পাহারা – না প্লেগ না দজ্জাল এখানে প্রবেশ করতে পারে।"[৩৩]

সহিহাইনে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদিসেও অনুরূপ বাণী রয়েছে।

তিনি বলেছেন, রাসূল (সাঃ) বলেন :

"এমন কোন ভূমি নেই যেখানে দজ্জাল প্রবেশ করবে না কিন্তু মক্কা ও মদীনা ছাড়া। মক্কা ও মদীনা অভিমুখী এমন কোন রাস্তা নেই যেখানে সারিবদ্ধ ফিরিশতারা পাহারা দেয় না। এরপর সে (দজ্জাল) মদীনার নিকটবর্তী এক খোলা যায়গায় অবস্থান নেবে। ইতোমধ্যে মদীনায় তিনবার ভূমিকম্প হবে। ফলে অবিশ্বাসী ও মুনাফিকরা এখান থেকে বেরিয়ে তার পানে ছুটে যাবে।"[৩৪]

বুখারী শরীফের আর এক হাদীসে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন :

"মসীহে দজ্জালের ভয় মদীনায় প্রবেশ করবে না। সেদিন মদীনা প্রবেশের সাতটি রাস্তা থাকবে, প্রত্যেক রাস্তায় দু'জন করে ফিরিশতা পাহারায় থাকবে।"[৩৫]

মদীনার এ সমস্ত ফজিলতের ঊর্ধ্বে এমন দু'টো ফজিলতের কথা বলা যায়, যার সাথে পৃথিবীর অন্য কোন নেয়ামতের তুলনা হয় না। সে দু'টো হচ্ছে :

১। এখানে রয়েছে রাহমাতুল্লিল আলামীনের রওজা মোবারক (বেহেশতের নিদর্শন)।

২। এখানে রয়েছে নবী করীম (সাঃ) এর স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত পবিত্র মসজিদে নববী

মদীনার ফজিলত সম্পর্কে হযরত মালিক বিন আনাস (রাঃ) বলেন :

"এটি হিজরতকারীদের আবাস স্থল, সুন্নাহর উৎপত্তি ও লালনগাহ, শহীদানদের আবেষ্টনী। সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর পিয়ারা নবীর (সাঃ) আশ্রয়স্থল হিসেবে একে পছন্দ করেছেন। এখানেই স্বীয় মাহবুবের কবরগাহের ব্যবস্থা করেছেন, জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্যে এটি একটি বাগান এবং এখানেই রয়েছে আল্লাহ্র হাবীবের (সাঃ) মিম্বর।"[৩৬] অধিকন্তু এখানেই রয়েছে ঐতিহাসিক কু'বা মসজিদ

রাসূলে পাক (সাঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফের সবুজ গম্বুজ

মদীনার প্রতি রাসূল (সাঃ) এর ভালবাসা

আল্লাহ্‌র রাসূলের (সাঃ) প্রতিটি কথায় ও ঘোষণায় মদীনার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর মঙ্গল কামনায় অকৃত্রিম আন্তরিকতা ফুটে উঠে তাঁর প্রার্থনার ভাষায়। মানুষের অন্তরে যাতে মদীনার প্রতি ভালবাসা জাগ্রত হয় সে জন্য মহান আল্লাহ্‌র শাহী দরবারে তিনি এ প্রার্থনা নিবেদন করেন :

"হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের জন্য প্রিয় করে দাও যেভাবে আমরা মক্কাকে ভালবাসি, এমন কী তার চেয়েও বেশি।"[৩৭]

আল্লাহ্‌র দরবারে প্রিয় নবীর (সাঃ) প্রার্থনা যে কবুল হয়েছে তাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। মদীনার প্রতি আল্লাহ্‌র হাবীবের (সাঃ) ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে এমন হাদিসের সংখ্যা অসংখ্য। তাঁর বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন :

"মদীনা হচ্ছে সেই জনপদ যেখানে আমি হিজরত করেছি এবং যেখানে রয়েছে আমার আপন নিবাস এবং আমার উম্মতের (মুসলমানদের) দায়িত্ব হচ্ছে আমার প্রতিবেশিদের হেফাজত করা।"[৩৮]

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদিস থেকেও মদীনার প্রতি আল্লাহ্‌র হাবীবের (সাঃ) ভালবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, যখনই হুজুরে আকরাম (সাঃ) কোন সফর থেকে ফিরতেন আর মদীনার দেয়ালে তাঁর দৃষ্টি পড়ত তিনি তাঁর চলার গতি দ্রুততর করে দিতেন। তিনি যদি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ অবস্থায় থাকতেন তাকে দ্রুত পরিচালনা করতেন।

এরূপ করতেন মদীনার প্রতি তাঁর ভালবাসার কারণেই।[৩৯]

মদীনার অলংঘনীয় পবিত্রতা

মদীনার অলংঘনীয় পবিত্রতা এর সর্বোত্তম ফজিলত সমূহের অন্যতম। বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সাথে ইসলামের কিছু বিধিবিধানও জড়িত যে এটি আলাদাভাবে আলোচিত হবার দাবি রাখে।

সহিহ্ হাদিসের মাধ্যমে মদীনার অলংঘনীয় পবিত্রতা স্বীকৃত হয়েছে তেমনি একটি হাদিস হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন জায়েদ বিন আসিম (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন :

"নিশ্চয়ই হযরত ইবরাহিম (আঃ) মক্কা নগরীকে পবিত্র (হারাম) ঘোষণা করেছেন এবং এর বাসিন্দাদের জন্য করুণ মিনতি জানিয়েছেন। হযরত ইবরাহিম (আঃ) যেভাবে মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন আমিও অনুরূপ ভাবে মদীনাকে হারাম ঘোষণা করি। আমি মদীনার ছা' আর মু'দের মধ্যে দ্বিগুণ বরকতের প্রার্থনা করি, যেভাবে হযরত ইবরাহিম (আঃ) মক্কার লোকদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।"[৪০]

মদীনার পবিত্রতা অলংঘনীয় একথা যারা বিশ্বাস করে এ হাদিস তাদের পক্ষে দলিল সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতও তাই। দশজন সাহাবা কর্তৃক এ হাদিস হুজুরে আকরাম (সাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

সহিহাইনে বর্ণিত হযরত আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন :

"আয়ার ও সওর পর্বতের মধ্যবর্তী সমগ্র মদীনা হারাম (পবিত্র)। অতএব যে এখানে কোন পাপাচার করে অথবা যে কোন পাপাচারীকে এখানে আশ্রয় দান করে, তার ওপর আল্লাহ, সকল ফিরিশতা ও জনসাধারণের অভিশাপ এবং শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তার কাছ থেকে সার্ফও গ্রহণ করবেন না, আদলও নয়।"[৪১]

সহিহাইনে অন্তর্ভুক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি যদি দেখি যে, গজলা-হরিণ মদীনার জমিনে চরতেছে তথাপি আমি তাদের হতচকিত করব না।"

এবং রাসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেছেন :

"দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী যা আছে সবটুকু হারাম।"[৪২]

এতে প্রমাণিত হয় যে, মদীনা শরীফে শিকার করা কিংবা এর গাছপালা কর্তন করা নিষিদ্ধ। হাদিস শরীফে একথাও বলা আছে যে, সওর ও আয়ার পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলও হারাম (পবিত্র– অমুসলিমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ)।

সওর হচ্ছে উহুদ পাহাড়ের পেছনে একটি ছোট পাহাড়। এর রং লাল এবং এটি ওপরের দিকে খাড়া যেন একজন মানুষ সটান দাঁড়িয়ে আছে বর্তমানে এ পাহাড়ের পেছনেই রয়েছে জেদ্দাগামী বিমান বন্দর সড়ক এবং এটি হারামের সীমানা বেষ্টন করে আছে।[৪৩] যাতে করে অমুসলিমগণ এ পবিত্র ভূমির ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে না পারে। আর আয়ার হচ্ছে বৃহৎ এক কৃষ্ণপর্বত। এটি জুল হুলায়ফার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।[৪৪]

হারামের এ ঘোষণার অর্থ : এখানে শিকারকে তাড়া করা যাবে না, এখানকার বৃক্ষাদি কর্তন করা যাবে না, এখানে হারানো সম্পদ (পথে-ঘাটে পড়ে থাকা বস্তু) তুলে নেয়া যাবে না। সকল বিবেচনায় এর মর্যাদা মক্কার হারাম শরীফের মতই।

এ বিষয়ে হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে। তিনি বলেছেন, হুজুরে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

"এর গাছগুলো কাটা যাবেনা, শিকারকে তাড়া করা যাবে না, প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করার উদ্দেশ্য ব্যতীত এখানকার হারানো কোন বস্তু তুলে নেয়া যাবে না, পালিত উটের খাদ্য যোগান দেয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত এর গাছপালা কর্তন করা বৈধ হবে না।"[৪৫]

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত এক হাদিসে হুজুর পুর নুর (সাঃ) বলেছেন:

"এখানকার গাছপালার পাতা ছাটা যাবে না, কাটাও যাবে না।"[৪৬]

বর্ণিত সকল হাদিসই এ কথা নিশ্চিত করে যে, মদীনার পবিত্রতা অলংঘনীয়, এতে শিকার নিষিদ্ধ, এর গাছ পালা ও ঘাস কর্তন অবৈধ এবং মক্কার হারাম শরীফের মর্যাদা হতে এর মর্যাদা কোন অংশে কম নয়।[৪৭]

আয়ার পর্বত

মদীনার নিকটবর্তী আয়ার পর্বত

মদীনা মুনাওয়ারার দক্ষিণে এ পর্বতের অবস্থান। এখান পর্যন্তই হারামের সীমানা। মক্কা শরীফ হতে হিজরত করে নবী করীম (সাঃ) এ পর্বতের পূর্ব পাদদেশে তশরীফ রেখেছিলেন। হাদিসে ঘোষিত হয়েছে ঃ হারাম শরীফ আয়ার ও সওরের মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং তিনি আয়ারের পূর্ব ঢালু থেকে ওয়াদী রানুনায় অবতরণ করেছিলেন।[৪৮] আয়াদ বলেন, আয়ারকে মদীনার অংশ নয় মনে করার মূলে কোন ভিত্তি নেই। কারণ এটি সুবিদিত এবং আরবী কাব্য সাহিত্যে এর উল্লেখ রয়েছে।[৪৯]
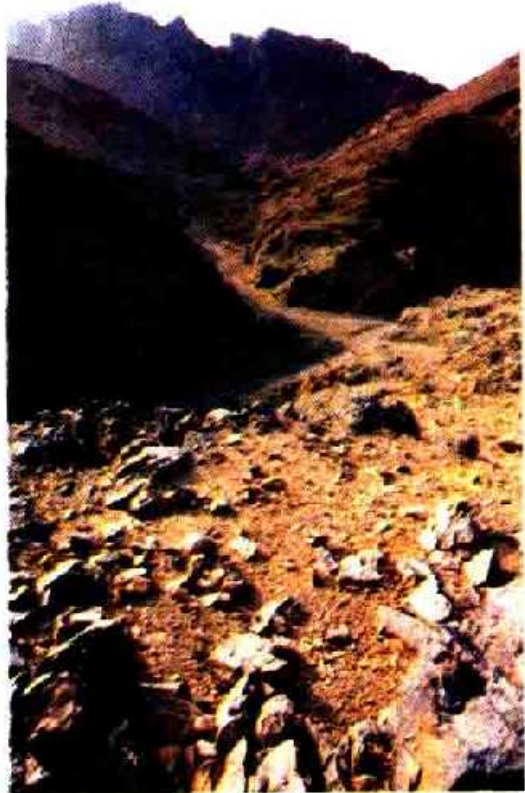
সওর পর্বত

একথা সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহর পিয়ারা হাবীব (সাঃ) ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হিজরতের প্রাক্কালে মক্কায় অবস্থিত সওর গিরি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। মদীনাতেও একই নামে আরেকটি পর্বত আছে জাহেলীয়া[৫০] যুগে যেমন ইসলাম পরবর্তী যুগেও মদীনার লোকজন এ পর্বত সম্পর্কে অবগত ছিল। এটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের লাল মাটির পাহাড়, উহুদের পেছনে ষাঁড়ের মত এর অবস্থান। যখন 'পর্বত' অভিধায়

মদীনার নিকটবর্তী সওর পর্বত

সওর-এর উল্লেখ করা হয় তখন তাতে মদীনার সওর পর্বতকেই বোঝায়। মক্কার সওরের ক্ষেত্রে কিন্তু 'পর্বত' শব্দ ব্যবহৃত হয় না। এটিই উভয় সওরের মধ্যে পার্থক্য এবং আল্লাহ চাহেন তো এতে সকল সংশয় বিদূরিত হতে বাধ্য। আর হাদিস শরীফে রাসূলে করীম (সাঃ) সওর ও আয়ারের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম ঘোষণা করেছেন। বিমান বন্দর সড়ক এ সওর পর্বতের উত্তর পাশ দিয়ে জেদ্দার দিকে চলে গেছে হজ্বের শহরকে (মক্কা) পাশ কাটিয়ে। রাস্তাটি সওর পর্বতের পেছন দিকে থাকার কারণ হল যাতে অমুসলিমরা মদীনা শরীফকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে।[৫১]

হিজরতের পূর্ববর্তী ঘটনাবলী

সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন চাইলেন যে তাঁর দ্বীন বিজয়ী হোক, তাঁর নবী ক্ষমতাবান হোন আর তাঁর ওয়াদা পূর্ণ হোক, আল্লাহর নবী হজ্ব মৌসুমে বের হয়ে আনসারদের[৫২] একটি দলের সাথে মিলিত হলেন। প্রত্যেক হজ্ব মৌসুমের মত এবারও তিনি আরব গোত্রদের কাছে নিজকে পেশ করলেন এবং এক পর্যায়ে আকাবাতে খাজরায গোত্রের একটি দলের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আল্লাহ তাদের কল্যাণ চেয়েছিলেন তাই আল্লাহর নবী (সাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কারা?" তারা জবাব দিল, "আমরা খাজরায গোত্রের লোক।" তিনি আবার জানতে চাইলেন, 'ইহুদীদের সাথে যাদের চুক্তি হয়েছে সেই খাজরায কি?" তারা বলল, "হাঁ"। তিনি বললেন, "তোমরা কি একটু বসবে যাতে আমি তোমাদের সাথে কিছু কথা বলতে পারি?" তারা বলল, "অবশ্যই।" অতপর তিনি তাদের সাথে বসলেন, সর্বশক্তিমান পরম পরাক্রমশালী আল্লাহর দিকে তাদের আহবান করলেন, ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং পবিত্র কোরআন থেকে তাদেরকে তিলাওয়াত করে শোনালেন।

তাদের ইসলাম গ্রহণের অন্যতম কারণ ছিল তাদের শহরে যে সমস্ত ইহুদীর সাথে তারা বসবাস করতো সে সকল ইহুদী ছিল কিতাবী এবং জ্ঞানী। পক্ষান্তরে আরবরা ছিল বহু ঈশ্বরবাদী ও পৌত্তলিক। খাজরাযরা ইহুদীদের পরাজিত করেছিল। যখনই উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিত ইহুদীরা বলত, 'অচিরেই একজন নবীর আগমন ঘটবে, তাঁর আগমনের দিনক্ষণ আসন্ন। আমরা হব তাঁর অনুসারী, তাঁর সহায়তায় আমরা তোমাদের হত্যা করব যেভাবে আদ ও ইরাম জাতিকে হত্যা করা হয়েছিল।"

তাই যখন আল্লাহর নবী তাদের সাথে কথা বললেন আর আল্লাহর দিকে আহবান করলেন তারা একে অন্যকে বলল, "আল্লাহর শপথ! তোমরা অবশ্যই জান, ইনিই সেই নবী যাঁর উল্লেখ করে ইহুদীরা তোমাদেরকে ভয় দেখায়; অতএব তাঁকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে তোমাদের অগ্রগামী হতে দিওনা।"

তাই তারা নবী করীম (সাঃ) এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনল এবং ইসলামের দাওয়াত কবুল করল। তারা নবী করিম (সাঃ) কে বলল ঃ আমরা আমাদের লোকজনদের ফেলে এসেছি, তাদের পরস্পরের মাঝে এমন শত্রুতা ও রেষারেষি বিদ্যমান যা অন্য কোথাও নেই, তাই আমরা আশা করি আল্লাহ আপনার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করবেন। আমরা তাদের কাছে যাব, তাদের এ ধর্মের প্রতি আহবান জানাব এবং এ ধর্মের যা কিছু আমরা আপনার কাছ থেকে গ্রহণ করেছি তা তাদের কাছে পেশ করব। যদি এর ভিত্তিতে আল্লাহ তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দেন তাহলে আমাদের কাছে আপনি ছাড়া অধিক প্রিয় দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি থাকবে না।" অতপর তারা আল্লাহর নবী (সাঃ) থেকে বিদায় নিল, স্বদেশে ফিরে গেল অনন্য এক ঈমানকে বুকে ধারণ করে।

বর্ণিত আছে যে, সেখানে খাজরায গোত্রের ছয়জন লোক ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেনঃ ১. আসাদ বিন জুররাহ, ২. আউফ বিন আফরা (আফরা তাঁর মায়ের নাম আর তাঁর পিতার নাম ছিল আল হারিস বিন রিফাহ) ৩. রাফি বিন মালিক আয-যুরকী, ৪. কুতবা বিন আমীর আস সুলামী, ৫. উকবা বিন আমীর (কোন কোন বর্ণনায়, উকবা নয় তিনি ছিলেন মুয়াইদ বিন আফরা), ৬. জাবীর বিন আবদুল্লাহ।[২৩]

আকাবার প্রথম প্রতিজ্ঞা

খাজরায গোত্রের মুসলমানরা যখন মদীনায় তাদের লোকজনের কাছে ফিরে গেল তারা আল্লাহর নবীর (সাঃ) বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দিল। পরবর্তী হজ্ব মৌসুমে ১২ জন আনসার মক্কায় এলেন। আল্লাহর নবী (সাঃ) তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আল আকাবার প্রান্তরে তারা আল্লাহর নবী (সাঃ) এর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল। মহিলারাও অনুরূপ শপথ গ্রহণ করেছিল। এটি এমন এক সময়ে ঘটেছিল যখন জিহাদ ফরজ হয়নি।[২৪]

আবু ইদ্রিছ আই'জুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, বদরের মাঠে জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত ওবায়দা বিন আসসামিত (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। আকাবার প্রথম রাত্রিতে অন্যান্যদের মাঝে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, হুজুরে আকরাম (সাঃ) বলেছেন, "আমার সাথে তোমরা এ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করো যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কারো শরীক করবে না, চুরি করবে না, অবৈধ যৌন ব্যভিচার করবেনা, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেবে না, ইসলামের কোন বিধি-বিধান অমান্য করবে না। যে এ প্রতিজ্ঞায় অটল থাকে তার পুরস্কার আল্লাহর হতে, আর কেউ যদি এ সমস্ত অন্যায় কাজের কোনটি করে আর আল্লাহ তা গোপন রাখেন, এর প্রতিবিধান আল্লাহর এখতিয়ারে, আল্লাহ চাহেন তো তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, চাহেন তো তাকে শাস্তি দিতে পারেন।"

যেখানে আকাবার প্রথম প্রতিজ্ঞা অনুষ্ঠিত হয়েছিল

"এবং এরই ওপরেই আমরা তাঁর কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহন করি।"[২৫]

মুয়াল্লিম (শিক্ষক) নিয়োগ

হযরত মুসাব বিন উমরই(রাঃ) ইসলামের প্রথম মুয়াল্লিম। আকাবার প্রথম প্রতিজ্ঞার পর আল্লাহর হাবীব (সাঃ) তাঁকে নওমুসলিমদের সাথে মদীনায় পাঠান। তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল মদীনার মুসলমানদের কোরআন শিক্ষা দেয়ার, ইসলামী শিক্ষা দানের ও ধর্মীয় বিধান অনুধাবনে তাদের সাহায্য করার। হযরত মুসাব বিন ওমর (রাঃ) মদীনায় মুকরীঙ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি হযরত আসাদ বিন জুররাহ (রাঃ) এর ঘরে অবস্থান করতেন। তাঁর শিক্ষা ও দক্ষ প্রচারনার গুণে হযরত সা'দ বিন মুয়াজ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত আসাদ বিন জুররাহ (রাঃ) এর মামাতো ভাই এবং গোত্র প্রধান। একই ভাবে হযরত উসাইদ বিন হুদাইর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। এঁদের মাধ্যমেই মদীনায় ইসলাম প্রচার শুরু হয় ও দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। মদীনায় এমন কোন ঘর ছিল না যেখানে অন্তত একজন মুসলমান ছিলেন না।

আকাবার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মানুষজনকে তাদের গৃহে, ওকাজের মেলায়, মিজান্নার সমাবেশে এবং হজ্ব মৌসুমে মিনার প্রান্তরে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। এভাবে মক্কায় কাটল তাঁর দশ বছর। তিনি বললেন :

"কে আমাকে আশ্রয় দেবে? কে করবে আমাকে সমর্থন? যাতে আমি আমার প্রভুর বাণী মানুষের মাঝে প্রচার করতে পারি, যাঁর এখতিয়ারে রয়েছে জান্নাত।"

এতে লোকজন তাঁর পাশে জড়ো হলো। তারা বলল, "হে কুরাইশের সন্তান! হুঁশিয়ার হও। নিজেকে মানুষের কাছে বিচারের সম্মুখীন করো না!"

যখন আল্লাহর নবী (সাঃ) তাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন লোকজন তাঁর দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখাতে থাকল।

আনসাররা বলল ঃ "আল্লাহর নবী (সাঃ) কে আর আমরা কতদিন মক্কার পাহাড়ের ঘেরাওয়ের মধ্যে ভয় ভীতিতে আবদ্ধ রাখব?"

অতএব হজ্ব মৌসুমে মদীনার ৭০ জন আনসার আকাবায় হুজুর (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করল। একজন দু'জন করে যখন সবাই এসে গেল তখন তারা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কী শর্তে আমরা আপনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবো?" তিনি বললেন :

"এ মর্মে শপথ গ্রহণ করো যে, যুদ্ধ ও শান্তি সর্বাবস্থায় তোমরা আমার আনুগত্য করবে এবং আমাকে মেনে চলবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে অসৎ কাজে বাধা দেবে, আল্লাহর খাতিরে সত্য বলবে এবং কারো সমালোচনার পরোয়া করবে না। আমি যখন তোমাদের মাঝে উপস্থিত হব আমাকে তেমনভাবে সমর্থন করবে ও রক্ষা করবে যেভাবে তোমরা পরস্পরকে সুরক্ষা দিয়ে থাক, যেভাবে রক্ষা করে থাক নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের। বিনিময়ে তোমরা হবে জান্নাতের অধিকারী।"

এতে তারা সবাই ওঠে দাঁড়াল এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ উচ্চারণ করল

হযরত আসাদ বিন জুররাহ (রাঃ) ছিলেন উপস্থিত আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ। তিনি বললেন ঃ "হে ইয়াসরিববাসী! তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো, ইনি যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সে কথা না জেনে আমরা তাঁর কাছে আসিনি এবং তাঁকে গ্রহণ করা মানে সমগ্র আরবের রোষানলের মুখোমুখি হওয়া। এর অর্থ হচ্ছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তমের মৃত্যুর ঝুঁকি গ্রহণ করা এবং তলোয়ারের ঝনঝনৎকার শ্রবণ করা। হয়তো তোমাদেরকে ধৈর্যসহকারে সকল বিপদ মোকাবিলার মানসিকতা অর্জন করতে হবে, সেক্ষেত্রে তোমাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে নতুবা জীবনের ভয়ে তোমাদের খামোশ থাকতে হবে এবং তা হবে আল্লাহর সমীপে তোমাদের পেশ করার মত ওজর।"

এতে অন্যরা বলল, "হে আ'সাদ! তুমি ক্ষান্ত হও, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এ শপথ থেকে বিচ্যুত হব না, এ প্রতিজ্ঞা থেকে ফিরেও আসব না।"

ফলে সবাই আল্লাহ্‌র রাসূলের (সাঃ) প্রতি আনুগত্যের শপথ নিল। তিনি তা গ্রহণ করলেন, বিনিময়ে তাদেরকে দিলেন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।[২৭]

যেখানে আকাবার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা অনুষ্ঠিত হয়েছিল

এ শপথকে আরও পাকাপোক্ত করার জন্য হযরত আল বা'রা বিন মারুর (রাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এর হস্ত মোবারক স্পর্শ করে বললেন, "সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, আমরা আপনাকে সেভাবেই রক্ষা করব যে ভাবে যে কোন মুসিবতে আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনদের রক্ষা করে থাকি। অতএব হে আল্লাহ্‌র দূত! আমাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন। আল্লাহ্‌র কসম আমরা যুদ্ধের সন্তান, আমরা হাতিয়ারের জাত, আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে তা লাভ করেছি।"

যারা আশংকা করেছিল যে, আল্লাহ্ যদি তাঁর হাবীব (সাঃ) কে সাহায্য করেন আর তিনি বিজয় লাভ করেন তখন তিনি তাদের (আনসারদের) পরিত্যাগ করে আপন জাতির মাঝে ফিরে যাবেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন ঃ

"না, তোমাদের অঙ্গীকার আমার অঙ্গীকার, আমার সুরক্ষা তোমাদের সুরক্ষা। আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা আমার মধ্য থেকে তোমরা যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আমার লড়াইও তাদের বিরুদ্ধে, তাদের সাথেই শান্তি স্থাপন করব যাদের সাথে তোমাদের হবে সন্ধি।"

আল্লাহ্‌র হাবীব (সাঃ) আরও বললেন :

"তোমরা ১২ জন নেতা নির্বাচন কর যারা তোমাদের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে।"

এতে তারা ১২ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করল। তম্মধ্যে ৯ জন খাজরায গোত্র হতে, বাকী ৩ জন আউস গোত্র হতে।[২৮]

মদীনায় হিজরত

আল্লাহ্‌র পিয়ারা হাবীব (সাঃ) মক্কায় অবস্থান কালে এক সময় তাঁর কাছে হিজরতের নির্দেশ আসে। মহান আল্লাহ্‌র তরফ হতে নাযিল হয় ওহী :

রাব্বি আদ্‌খিলনি মুদখালা চিদ্‌ক্বিন ওয়াআখরিয্‌নি মুখরাজা চিদ্‌ক্বিন।

"(হে মুহাম্মদ) বলুন, 'হে আমার রব! আমাকে প্রবেশ করান কল্যাণের সাথে এবং নিষ্ক্রান্ত করান কল্যাণের সাথে এবং আপনার তরফ হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮০)[৩৯]

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর সাথে মদীনার অধিবাসীদের আনুগত্যের শপথ সাধিত না হওয়া পর্যন্ত হিজরতের আয়াত নাযিল হয়নি। আল্লাহ্‌র নবী(সাঃ) তাঁর সাথীদের মদীনায় হিজরতের এবং মদীনার আনসারদের মধ্যে তাদের ভাইদের সাথে মিলিত হবার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন :

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য ভাইয়ের এবং গৃহের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যেখানে তোমরা নিরাপদে থাকবে।"

তাই অনেক সাহাবী মদীনায় হিজরত করলেন। আর আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) স্বয়ং রয়ে গেলেন মক্কায়। তিনি অপেক্ষা করে রইলেন আসমানী নির্দেশের। মুসলমানদের মক্কা ত্যাগ অব্যাহত থাকায় কাফিররা বুঝতে পারল মুসলমানরা অন্য কোথাও বসবাসের নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছে। নবী করীম (সাঃ) আবার কখন মক্কা ছেড়ে চলে যান এ ব্যাপারে তারা সজাগ হয়ে রইল। আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তারা দার-উন-নদওয়ায়[৪০] বৈঠক আহ্বান করল। সেই সমাবেশে কেউ বলল : "চল, আমরা তাঁকে আমাদের মাঝ থেকে বহিষ্কার করে দেই।" অন্যরা বলল, "না, আমরা তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখি যে পর্যন্ত না তিনি না খেয়ে মারা যান।" এসব শুনে আবু জেহেল (তার ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত) বলে উঠল: "আমার এমন এক প্রস্তাব আছে যা শোনার পর তোমরা দ্বিতীয় কোন প্রস্তাব আর গ্রাহ্য করবে না।" তারা বলল, "কী সেটি?" সে বলল, "চল আমরা প্রত্যেক গোত্র হতে একজন করে শক্ত-সমর্থ যুবককে বেছে নেই। প্রত্যেকের হাতে থাকবে এক একটি ধারালো তলোয়ার। সেই তলোয়ারে প্রত্যেকেই তার ওপর হানবে এক একটি আঘাত। এভাবে তাকে হত্যা করা হলে প্রত্যেক গোত্র সম্মিলিতভাবে শোধ করবে তার রক্ত ঋণ। আমি মনে করি সমগ্র কুরাইশ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একা যুদ্ধ করবার সাহস বনী হাশিম গোত্রের হবে না। ফলে তারা রক্তপণ গ্রহণে বাধ্য হবে এতে আমরাও মুক্তি পাব এবং যে ক্ষতি সে আমাদের করে চলেছে তারও হবে নিশ্চিত অবসান।"

হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে প্রিয় নবীকে কাফিরদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন এবং সে রাতে আপন শয্যায় না শুতে নির্দেশ দিলেন তাই আল্লাহ্‌র হাবীব সে রাতে আপন গৃহে থাকলেন না। আল্লাহ তাঁকে মক্কা ত্যাগের অনুমতি দিলেন। ফলে আল্লাহ্‌র মাহবুব নবী (সাঃ) হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে নির্দেশ দিলেন তাঁর (নবীর) সবুজ চাদর গায়ে দিয়ে তাঁরই বিছানায় শুয়ে থাকতে। হযরত আলী (রাঃ) তাই করলেন। তারপর আল্লাহ্‌র নবী(সাঃ) লোকজনের কাছে এলেন, তারা ভিড় করেছিল তাঁর দরজায়। তিনি এক মুঠো মাটি তুলে নিলেন আর তা নিক্ষেপ করলেন তাদের মাথার ওপরে। আল্লাহ তাঁর নবীকে (সাঃ) তাদের চোখের আড়াল করে দিলেন আর তিনি তিলাওয়াত করছিলেন সূরা ইয়াসীন ঃ

"ইয়াসীন। জ্ঞান গর্ভ বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ। নিশ্চয়ই (হে মুহাম্মদ) আপনি রাসূলদের একজন যিনি সত্য সহজ সরল পথের ওপর অধিষ্ঠিত। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে। যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা রয়ে গেছে গাফিল।

তাদের অধিকাংশের জন্য সে বাণী (শাস্তির) অবধারিত হয়ে পড়েছে, সুতরাং তারা ঈমান আনবে না। আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত লৌহ বেড়ি পরিয়েছি। ফলে তারা হয়ে গেছে ঊর্ধ্বমুখী। আমি তাদের সম্মুখে স্থাপন করেছি এক প্রাচীর ও পশ্চাতে স্থাপন করেছি আর এক প্রাচীর এবং তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি। ফলে তারা দেখতে পায় না।" (৩৬:১-৯)

মক্কা শরীফে যাঁরা হযরতের সাথে থেকে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। তিনি আল্লাহর হাবীব (সাঃ) এর নিকট হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। তার জবাবে রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছিলেন:

"ব্যস্ত হয়োনা, এমনও হতে পারে যে আল্লাহ তোমাকে একজন উত্তম সঙ্গী দেবেন।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) আশা করেছিলেন হিজরতের সেই উত্তম সঙ্গী হবেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিজেই। তাই তিনি নিজের গৃহে দু'টো সওয়ারী যোগাড় করে রাখলেন এবং উপযুক্ত খাবার দাবার দিয়ে সওয়ারী দু'টোকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করে রাখলেন। প্রিয় নবীর আদত (স্বভাব) ছিল যে তিনি সকাল অথবা সন্ধ্যা ব্যতীত কখনো হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর বাড়ি গমন করতেন না। অতপর সে দিন এসে উপস্থিত হল যেদিন তিনি জন্মভূমি মক্কা ও আপন লোকজন ছেড়ে হিজরত করার অনুমতি প্রাপ্ত হলেন। তাই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তিনি ভাবলেন এ মুহূর্তে প্রিয় নবী (সাঃ) এর তাঁর বাড়িতে আসার পেছনে নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। যখন নবী করিম (সাঃ) তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) স্বীয় বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লেন। নবী করীম (সাঃ) তাতে তশরীফ রাখলেন। সেখানে তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর দু'কন্যা হযরত আয়িশা ও হযরত আসমা (রাঃ) ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না।

নবী করীম (সাঃ) বললেন : "এদের দু'জনকে ভেতরে যেতে বলুন।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বললেন : "হে আল্লাহর রাসূল! তারা দু'জনই আমার কন্যা। আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, বিষয়টা কী?"

তিনি জবাবে বললেন : "আল্লাহ আমাকে হিজরতের নির্দেশ দিয়েছেন।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) জানতে চাইলেন: "আর আপনার সাথী সম্পর্কে?"

নবীয়ে পাক (সাঃ) বললেন : "আমার সাথী সম্পর্কেও।"

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন : "আল্লাহর কসম, আমি আর কাউকে কোনদিন আনন্দে এমন কাঁদতে দেখিনি সেদিন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে যেভাবে কাঁদতে দেখেছিলাম।"

আর রাসূলে আকরাম (সঃ) মাতৃভূমি মক্কাকে ছেড়ে যেতে তাঁর হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। পবিত্র মক্কাকে সম্বোধন করে অশ্রুসজল নয়নে তিনি বলেন :

মা-আত্বইয়্যাবাকা মিন বালাদীন ওয়া আহাব্বাকা ইলাইয়া ওয়া লাউলা- আন্না কাওমী আখরাজুনী মিনকা মা-সাকানতু গাইরাকা।

অর্থাৎ- "হে মক্কা তুমি কতইনা উত্তম শহর এবং তুমি কতইনা আমার প্রিয়। আমার গোত্রের লোকজন যদি আমাকে এখান থেকে বের করে না দিত, তা হলে তোমাকে ত্যাগ করে আমি কখনো অন্য কোথাও অবস্থান করতাম না।"

মক্কা হতে বিদায়

মদীনার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত নামে একজন লোককে নিয়োগ করেন। সে ছিল মুশরিক। তাঁরা উভয়ে নিজ নিজ সওয়ারীতে উপবিষ্ট হয়ে যাত্রা শুরু করেন। আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) হিজরতের কথা হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও তাঁর পরিবারের কয়েকজন লোক ছাড়া আর কেউ জানত না।

আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) ও তাঁর সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) দু'জন একত্রে রওনা দিলেন। তাঁরা মক্কার পেছনে সওর পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে এর গুহার অভ্যন্তরে আশ্রয় নেন। এদিকে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ্‌কে লোকজনের গতিবিধি ও আলাপ আলোচনার খোঁজ খবর রাখার কাজে আগেভাগেই নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি দিনের বেলায় সব খবরাখবর যোগাড় করতেন আর সন্ধ্যায় গিরিগুহায় গিয়ে সবকিছু জানাতেন। আমীর বিন ফুহাইরা ছিল হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর গোলাম। সে গুহার আশে পাশে ভেড়া চরাত এবং সন্ধ্যায় সেখানে বিশ্রাম নিত। এভাবে হযরত আবদুল্লাহ বিন আবু বকর (রাঃ) সারাদিন কুরাইশদের মাঝে কাটাতেন। আল্লাহর নবী (সাঃ) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সম্পর্কে তারা কী বলাবলি করত তা ও তাদের পরিকল্পনার কথা জেনে নিতেন এবং সন্ধ্যায় সুযোগমত তা তাঁদেরকে জানিয়ে দিতেন। আমীর বিন ফুহাইরা মক্কার লোকদের পশুপাল চরাত এবং সন্ধ্যায় হযরত আবু বকর (রাঃ) এর মেষপালকে সেখানে বিশ্রাম দিত। সেখানে মেষের দুধ দোহন করা হত ও মেষ জবেহ করা হত। তা-ই ছিল আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীর খাদ্য। হযরত আবদুল্লাহ বিন আবু বকর (রাঃ) মক্কার দিকে ফিরে যাবার সময় আমীর বিন ফুহাইরা তার ভেড়ার পালকে পেছনে পেছনে নিয়ে আসত যাতে তাঁর পদচিহ্ন মুছে যায়। এভাবে তিন রাত্রি কেটে গেলে লোকজনের আলোচনা স্তিমিত হয়ে এল। তখন আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত যাকে পথ প্রদর্শক হিসেবে আগেই নিয়োগ করা হয়েছিল সে নিজের একটি উটসহ আরো দু'টো উট নিয়ে সওর গিরি গুহার কাছাকাছি উপস্থিত হল। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) তাঁদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু খাবার বাঁধার জন্য কোন ফিতা বা কাপড় নিতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। যখন তাঁরা রওনার উদ্যোগ নিলেন আর আসমা খাবার বেঁধে দেয়ার জন্য কিছু খুঁজে পেলনা তখন তিনি নিজের কোমর বন্ধ ছিঁড়ে দু'টুকরো করলেন ও তা দিয়ে খাদ্যগুলো বেঁধে দিলেন। এজন্য তাঁর উপাধি হয়ে পড়েছিল, "যাতুন নেতাকাইন" বা "দুই কোমর বন্ধের অধিকারিনী।"

মক্কার মুশরিকরা যখন দেখল যে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) ও তাঁর সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর কোন সন্ধান মিলছে না তখন তারা চারদিকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিল। উভয়কে ধরিয়ে দেয়ার জন্য তারা একশত উট পুরস্কার ঘোষণা করল। অনেকেই তাঁদের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে কিছুদূর অগ্রসর হল কিন্তু অচিরেই তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। সুরাইকা বিন মালিক নামে এক ব্যক্তিও অনুসন্ধান দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে ও তার সঙ্গীরা ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিল, যে পাহাড়ের গুহার অভ্যন্তরে হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) ও তাঁর সফরসঙ্গী আশ্রয় নিয়েছিলেন। শত্রুরা এ গুহার পাশ দিয়েই গিয়েছিল কিন্তু আল্লাহ শত্রুদের দৃষ্টি সীমা থেকে তাঁর হাবীব (সাঃ) ও সাথীকে রক্ষা করেছিলেন।

প্রথমাবস্থায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নবী করিম (সাঃ) কে ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন, "তাদের কেউ যদি নিজের পায়ের নিচ দিয়ে তাকাত তাহলে সে নির্ঘাত আমাদের দেখতে পেত।" আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বললেন :

"হে আবু বকর! কেন তুমি আমাদের দু'জনকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছ, যেখানে আমাদের তৃতীয় জন হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ?"

সওর গিরি গুহার ভেতরের দৃশ্য। দর্শনার্থীরা এখানে ঢুকে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে আল্লাহ্র দরবারে মুনাজাত করেন

এই সেই 'সওর গিরি গুহা' যেখানে হিজরতের সময় রাসূলে পাক (স:) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) তিন দিন তিন রাত অবস্থান করেছিলেন।

সওর গিরি গুহার মুখ

মক্কা শরীফের তিন মাইল দূরে অবস্থিত সওর গিরি

যথা সময়ে মদীনাবাসীদের মধ্যে একথা প্রচার হয়ে গেল যে, আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) তাদের মাঝে তশরীফ নিয়ে আসছেন; তারা আগ্রহ ভরে তাঁর আগমনের প্রত্যাশায় রইল। তারা ফজরের সালাতের পর মদীনার বাহিরে এসে বেলা দ্বিপ্রহরে সমস্ত ছায়াময় স্থান গুটিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করত। হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) এর উপস্থিতির দিন তারা অনুরূপ অপেক্ষা করে যার যার ঘরে ফিরে গিয়েছিল। মদীনাবাসীদের অধীর আগ্রহে প্রতিদিনের প্রতীক্ষা প্রত্যক্ষকারী একজন ইহুদী সর্বপ্রথম হযরত ও তাঁর সঙ্গীকে দেখতে পেয়েছিল। সে তার কণ্ঠস্বরের পুরো সদ্ব্যবহার করে বলে ওঠল, "হে কইলার[২] সন্তানেরা! তোমাদের সৌভাগ্য উপস্থিত হয়েছে!"

ঘোষণা শুনে মদীনাবাসী 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে দলে দলে ছুটে এল। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এক খেজুর গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সাথে ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন প্রায় সমবয়সী। মদীনাবাসী তখনও পর্যন্ত আল্লাহ্‌র হাবীব (সাঃ) কে আলাদাভাবে চিনত না। সূর্য গড়িয়ে ছায়া সরে গেলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাড়াতাড়ি নিজের উর্ধাঙ্গের পোষাক (সবুজ চাদর) খুলে নবী করীম (সাঃ) এর দেহ মুবারকের ওপর মেলে ধরলেন যাতে রোদের তেজ প্রতিহত হয়ে ছায়া হয়। তখনই মদীনাবাসী আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) কে তা শনাক্ত করতে পারল।[৩৩]

মুসলমানগণ তাঁর নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) সান্নিধ্যে এল। একটি প্রস্তরময় এলাকা থেকে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) সামনে অগ্রসর হলেন এবং কু'বা পল্লীর বনু আমর বিন আওফ এর গৃহপ্রাঙ্গণে পৌঁছলেন। তিনি সেখানে কুলসুম বিন আল হাদম এর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রথমে এক খেজুর গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন পরে সেখান থেকে কুলসুমের গৃহে গমন করেন। কুলসুম ছিলেন বনু আমর বিন আউফের মিত্র।

হযরত আনাস (রাঃ) এর বাচনিক বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল (সাঃ) নবুয়তের ১৩তম বর্ষের ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার কু'বা পল্লীতে উপস্থিত হন এবং সেখানে ১৪ রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করেন। বনু আমর বিন আউফের সাথে অবস্থানের দিন গুলোতে তিনি ইসলামের প্রথম মসজিদ কু'বা মসজিদ নির্মাণ করেন। কু'বা হতে অদূরে জুমার দিন উপস্থিত হলে রানুনা নামক উপত্যকার মধ্যস্থলে বনু সালিম বিন আউফের বাসস্থানে তিনি অবতরণ করেন। তাঁর সাথে কতিপয় মুসলমানও ছিলেন। পরবর্তীতে এখানেও তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা 'আল জুমুয়া মসজিদ' নামে পরিচিত।

মদীনার কেন্দ্রস্থলে আগমন

যখন আল্লাহ্‌র হাবীব (সাঃ) কু'বা ত্যাগ করে মদীনার কেন্দ্রস্থলে আগমনের ইচ্ছা করলেন তখন তিনি তাঁর মাতুল বংশীয় বনু নাজ্জারের বরাবরে সংবাদ পাঠালেন। তারা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে এলে তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে মদীনার কেন্দ্রপানে রওনা দিলেন। বহু সংখ্যক মুসলমানের সমভিব্যাহারে বনু নাজ্জারের লোকজন নবী করীম (সাঃ) এর চারপাশ ঘিরে এগিয়ে চলল। কেউ কেউ উপবিষ্ট ছিল আরোহীর পিঠে, কেউ বা হাঁটছিল পায়দলে। তাঁর ডানে বামে পেছনে ছিল জনতার ঢল। যখনই কোন জনপদ তাঁরা অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) কে তার আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাল। কিন্তু তিনি বললেন, "আমার সওয়ারীকে (নবী করীম সাঃ কে বহনকৃত উটনি) স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। সে আল্লাহ্‌ কর্তৃক আদিষ্ট।" অবশেষে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) কে বহনকারী উটনি-'কাসওয়া' বনু নাজ্জারের পল্লীতে মসজিদে নববীর বর্তমান স্থানে এসে থেমে পড়ল। আর তিনি আবু আইউব আল-আনসারী (রাঃ) এর গৃহ প্রাঙ্গণে অবতরণ করলেন।

মদীনার অধিবাসীগণ আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) আগমন উপলক্ষে উৎসবে মেতে ওঠেছিল। আল বারা (রাঃ) বলেন ঃ "আমি মদীনাবাসীকে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) এর আগমনের দিন যেভাবে উৎসবে মেতে ওঠতে দেখেছি অন্য কোন উপলক্ষে তাদেরকে সেভাবে উৎসবে মেতে ওঠতে দেখিনি।"[৬৪]
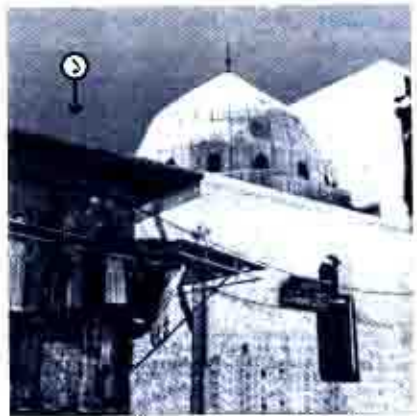
হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) এর গৃহ যা ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল (১ নং)

হিজরতের হাদিসে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বরাত দিয়ে আল বারা (রাঃ) আরও বলেন ঃ আমরা মদীনায় পৌছলাম রাতে, তারা আলোচনা করে চলল কার বাড়িতে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) মেহমান হবেন। কিন্তু তিনি বললেন ঃ "আবদুল মুত্তালিবের মাতৃবংশ বনু নাজ্জারের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমি তাদের মাঝেই থাকব।"

নর নারীরা গৃহের ছাদে অবস্থান নিয়েছিল, শিশু ও দাস-দাসীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল রাস্তায়। তারা সবাই বলছিল, 'হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহ্‌র রাসূল!'[৬৫]

আনসারদের বালিকারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে সুমধুর কণ্ঠে গেয়ে উঠল :

ত্বালায়াল বাদ্‌রু আলাইনা
মিন ছানইয়াতিল বিদায়ী
ওয়াজাবাস্‌ শুক্‌রু আলাইনা
মা-দা'য়া লিল্লাহি দায়ী
আইউহাল মাবউছু ফীনা
জে'তা বিল আমরীল মুতায়ী।

অর্থাৎ-"পাহাড়ের ঐ পার্শ্বদেশে যেখানে কাফেলাকে বিদায় দেয়া হয় ঠিক সেখানেই পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়েছে। যতদিন পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণকারী বিদ্যমান থাকবে, আমাদের উপর তাঁর শোকর আদায় করা ওয়াজিব হবে। হে পবিত্র সত্ত্বা! যিনি আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছেন, আপনি এমন হুকুম নিয়ে এসেছেন, যার প্রতি অনুগত হওয়া আমাদের উপর ওয়াজিব ও অবশ্য কর্তব্য।"

এদিকে বনু নাজ্জারের মেয়েরা সারিবদ্ধ হয়ে নবীজীকে খোশ আমদেদ জানিয়ে আবৃত্তি করল :

নাহ্‌নু জাওয়ারু মিন বনীন নাজ্জার
ইয়া হাব্বাযা! মুহাম্মাদুন জার-

অর্থাৎ-"আমরা নাজ্জার বংশের বালিকা! আমরা কতইনা সৌভাগ্যবতী- মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আজ আমাদের উত্তম প্রতিবেশী।"

যেদিন আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) মদীনায় আসেন সেদিনটি মদীনার ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। ইতিপূর্বে এ রকম দিন মদীনার ইতিহাসে কখনো আসেনি, ভবিষ্যতেও এ রকম আর কখনো কোন কালে আসবে না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ "যেদিন আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) মদীনায় আগমন করেন সেদিনের মত আনন্দ উজ্জ্বল সোনালী দিন আমি আর কখনো দেখিনি।"[৬৬]

এরপর আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) মসজিদে নববী নির্মাণের নির্দেশ দেন।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

আল্লাহ্র পিয়ারা হাবীব (সাঃ) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এমন কী তাদের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারও প্রবর্তন করেন। তিনি সাহাবীদের মধ্যে এজন্যই ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করেন যাতে প্রবাসে তাদের একাকিত্ব বোধ কেটে যায়, যাতে তাদের স্ত্রী ও পরিবার-পরিজন হতে বিচ্ছিন্নতার মর্ম যাতনা সহনীয় হয়ে ওঠে এবং তাদের উভয়ের মাঝে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব জোরদার হয়। এরপর ইসলাম ধর্ম যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে, মুহাজিরদের বিভক্ত পরিবার পুনঃ মিলিত হয়, একাকিত্ব কেটে যায় তখন সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রত্যাহৃত হয় এবং সকল বিশ্বাসী মুসলমানের মাঝে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পবিত্র কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে ঃ **ইন্নামাল মু'মিনূনা ইখওয়াতুন।**
"নিশ্চয়ই সকল মুমিন বান্দা পরস্পর ভাই ভাই।" (৪৯ ঃ ১০)

হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলেন ঃ সর্বশক্তিমান ও মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আমাদের সম্পর্কে, বিশেষত কুরাইশ এবং আনসারদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, তোমাদের সঙ্গে থেকে জিহাদ করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ আল্লাহ্র বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৭৫)

এটি এ জন্য যে আমরা কুরাইশরা (মুহাজির) যখন হিজরত করে মদীনায় আসি তখন আমাদের কোন সম্পদ ছিলনা কিন্তু আমরা আনসারদের পেয়েছি সর্বোত্তম ভাই হিসাবে। আমরা তাদেরকে ভাই হিসাবেই গ্রহণ করেছি, আমরা তাদের উত্তরাধিকার লাভ করেছি, তারা লাভ করেছে আমাদের উত্তরাধিকার। হযরত আবু বকর (রাঃ) খারিজা বিন জায়েদকে, হযরত উমর (রাঃ) অন্য একজনকে, হযরত উসমান বিন আফফান (রাঃ) বনু যুরাইল বিন সা'দ আয যুরাথির একজনকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করেন। আমি গ্রহণ করি কা'ব বিন মালিককে। আমি তাকে অস্ত্রের আঘাতে মারাত্মক আহত[৩৭] অবস্থায় পেয়েছিলাম, আল্লাহর কসম সে যদি সেদিন মারা যেত তাহলে আমিই হতাম তার সম্পদের উত্তরাধিকারী-কিন্তু যখন আল্লাহ্ পাক সুবহানাহু তায়ালা উক্ত আয়াত নাযিল করলেন তখন আমরা আমাদের উত্তরাধিকারের কাছে ফিরে গেলাম।[৩৮]

হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) মদীনায় পৌঁছলে নবী করীম (সাঃ) তাঁর সাথে হযরত সা'দ বিন আর রাবি' আল আনসারী (রাঃ) এর ভ্রাতৃত্বের (দ্বীনীভাই) সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। আনসারী ভাই তাঁর মুহাজির ভাইকে তাঁর সম্পদের অর্ধেক এবং এমন কী তাঁর দু' স্ত্রীর একজনকে গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বললেন, "আল্লাহ্ আপনার সম্পদ ও স্ত্রীর মধ্যে বরকত দান করুন। আমাকে শুধু বাজারের পথটা দেখিয়ে দিন।" বাজারে ঘি ও মাখন বিক্রি করে তিনি কিছু উপার্জন করলেন। কিছু দিন পর নবী করীম (সাঃ) তাঁর গায়ে হলুদের (মেহ্দীর) চিহ্ন দেখলেন। তিনি জানতে চাইলেন, "এ কী?" হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "মোহরানা কী দিয়েছ?" "এক তোলা স্বর্ণ।" -তিনি উত্তরে বললেন।

"তাহলে অলিমত (বৌ-ভাত) অনুষ্ঠান করো একটি বকরী দিয়ে হলেও।" -পরামর্শ দিলেন আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)।[৩৯]

এ ঘটনা আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বিরাজিত চমৎকার সম্পর্ক, হৃদ্যতা ও শুভবোধের পরিচয়বাহী। আনসারী ভাইয়েরা যেমন ছিলেন উদারচিত্ত তেমনি মুহাজির ভাইয়েরাও সে উদারতার কোন অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করেন নি। মুহাজিরগণ আনসারদের বদান্যতার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন এবং সব সময় তাঁদের উচ্চ প্রশংসা করতেন। তাঁরা এমনও মনে করতেন, আনসাররাই তাঁদের আত্মত্যাগের কারণে সমস্ত সওয়াব ও পুরস্কারের হকদার হয়ে পড়েছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদিসে জানা যায়, তিনি বলেন, "মুহাজেরিনরা বললেন – 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যাঁদের কাছে আশ্রয় নিয়েছি তাঁদের কোন তুলনা হয়না, তাঁদের বেশি থাকলে তাঁরা হয় বেশি উদার, অল্প সম্পদ থাকা অবস্থায়ও তাঁরা হন অধিক দানশীল। তাঁরা আমাদের জন্য যথেষ্ট খাদ্য-পানীয় যোগান দেন, তাঁরা প্রত্যেক কিছুতেই আমাদের সাহায্য করে থাকেন, আমাদের আশংকা হয় তাঁরাই তো সমস্ত সওয়াবের অধিকারী হয়ে পড়বেন।"

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, "না, তা নয়, তোমরা তাঁদের যে প্রশংসা কর, তাঁদের যে ধন্যবাদ দাও, সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে তোমরা তাঁদের জন্য যে প্রার্থনা কর, তা-ই তাঁদের পুরস্কার।"[৭০]

হিজরতের পর জন্মলাভকারী প্রথম মুসলিম শিশু

হিজরত পরবর্তীকালে মুহাজিরদের মধ্যে প্রথম জন্মলাভকারী ভাগ্যবান শিশু হচ্ছেন (পরবর্তীতে) অত্যন্ত সম্মানিত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন আয যুবায়ের (রাঃ)। হযরত আসমা (রাঃ) এর সূত্রে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি হামেলা (গর্ভবতী) ছিলেন এবং তাঁর পেটে তখন আবদুল্লাহ বিন আয যুবায়ের। তিনি বলেন ঃ আমার পূর্ণ গর্ভাবস্থায় আমি মক্কা ত্যাগ করি এবং মদীনার কু'বায় উপস্থিত হয়ে সেখানেই সন্তান প্রসব করি। আমি আমার সন্তানকে নিয়ে নবী করীম (সাঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে তাঁর পবিত্র কোলে স্থাপন করি।

তিনি একটি খেজুর চেয়ে নিলেন, তা চিবালেন এবং তাঁর মুখের রস বাচ্চার মুখে দিলেন। অতএব প্রথম যে জিনিস আমার ছেলের পেটে প্রবেশ করে তা ছিল আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর পবিত্র মুখের লালা। এরপর তিনি তার জন্য প্রার্থনা করলেন, তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং সে-ই ছিল ইসলামের প্রথম নবজাতক।"[৭১]

হযরত আয়িশা (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "ইসলামে জন্ম লাভকারী প্রথম শিশু হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন আয যুবায়ের। তারা তাকে আল্লাহর নবী (সাঃ) এর নিকট নিয়ে আসে। তিনি একটি খেজুর নেন, তা চিবান এবং বাচ্চার মুখে দেন। অতএব তার পেটে প্রথম প্রবেশকারী বস্তু হচ্ছে নবী করীম (সাঃ) এর থুথু।"[৭২]

আযান (সালাতের জন্য আহ্বান)

একদিন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মদীনায় খোশ হালে বসা ছিলেন। সেখানে মুহাজির ও আনসারগণ একত্রিত হয়েছিলেন। ইসলাম ইতোমধ্যে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাকাত আদায় ও সিয়াম পালন বাধ্যতামূলক হয়েছে, হদ (অপরাধের শাস্তির বিধান) পালনীয় হয়েছে, হারাম ও হালাল সুনির্দিষ্ট হয়েছে। হযরত (সাঃ) যখন মদীনায় প্রথম তশরীফ আনেন তখন মুসলমানগণ সালাতের সময় আপনা আপনি উপস্থিত হয়ে যেতেন। এ জন্য কোন আহ্বানের রীতি প্রচলিত ছিলনা। নামাযের জন্য কিভাবে লোকদের আহ্বান করা হবে আল্লাহর হবীব (সাঃ) এ বিষয়ে লোকজনের পরামর্শ চাইলেন। কেউ বলল-এ জন্য শিঙ্গায় ফু দেয়া হোক। এটি ইহুদীদের একটি রীতি বলে হুজুরে আকরাম (সাঃ) তা অপছন্দ করলেন। কেউ প্রস্তাব দিল-ঘন্টা ধ্বনি বাজানো হোক। কিন্তু তা খৃষ্টানদের রীতি বিধায় আল্লাহর নবী (সাঃ) তাও প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁদের এ আলোচনা চলা কালে সেখানে হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়েদ বিন ছা'লাবা (রাঃ) এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন বালহারিস বিন আল খাযরাজ এর ভাই। তিনি এসে এক স্বপ্নের বয়ান শোনালেন। তিনি বললেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! গত রাতে আমি এক স্বপ্ন দেখেছি। একটি লোক দেখি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তার পরনে দু'টো সবুজ পোষাক ও হাতে একটি ঘন্টা। আমি তাকে বললাম– হে আল্লাহর বান্দা, তুমি কি আমার নিকট তোমার ঘন্টাটি বিক্রি করবে? সে জানতে চাইল, 'তা দিয়ে করবে কী তুমি?' আমি বললাম, "এটি বাজিয়ে আমরা মানুষকে সালাতের দিকে আহ্বান জানাবো।" তখন লোকটি বলল ঃ "আমি কি তোমাকে এর চাইতে উত্তম জিনিস শিক্ষা দেব না?" আমি বললাম, "তা কী?" তখন সে জবাব দিল ঃ

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর
আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর
আশহাদু আন লা'ইলাহা ইল্লাল্লাহ
আশহাদু আন লা'ইলাহা ইল্লাল্লাহ
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ
হাইয়া 'আলাস-সালাহ 'হাইয়া আলাস্ সালাহ
হাইয়া 'আলাল ফালাহ 'হাইয়া আলাল ফালাহ
আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
অর্থাৎ–
আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান
আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল
সালাতের জন্য এসো, সালাতের জন্য এসো
কল্যাণের দিকে এসো, কল্যাণের দিকে এসো
আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান
আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের হকদার আর কেউ নেই

মসজিদে নববীর একটি মিনার

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ **অবশ্যই** এটি সত্য স্বপ্ন। ইনশাআল্লাহ! অতএব বেলালকে ডেকে নাও। তাকে এ বাক্য গুলো শিখিয়ে দাও। তাকে বলো, এ বাক্যগুলো দিয়ে সে যেন লোকজনকে নামাযের জন্য আহ্বান করে, কারণ তার গলার স্বর তোমাদের গলার স্বর থেকে উঁচু।

তারপর হযরত বেলাল (রাঃ) যখন এ বাক্যগুলো সহকারে মুসলমানদের নামাযের প্রতি আহ্বান জানালেন হযরত উমর (রাঃ) তাঁর চাদর হেঁচড়িয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এলেন। এসে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন– এসব বাক্যের অনুরূপ বাক্যই আমি স্বপ্নে শুনেছি।"

রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ।"[৭৩]

হযরত মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন জায়েদ (রাঃ) এর বর্ণনায় তিরমিজি শরীফে বলা হয়েছে ঃ তিনি বলেন, তাঁর পিতা বলেছেন ঃ আমরা সকলে জাগরিত হয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এর নিকট এলাম। তাঁকে আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানালে তিনি বলে ওঠেলেন, "অবশ্যই এ স্বপ্ন সত্য। অতএব বেলালকে খবর দাও কারণ তার স্বর তোমাদের স্বরের চেয়ে উঁচু ও প্রলম্বিত, যা স্বপ্নে দেখেছ তাকে তা শুনিয়ে দাও এবং এ সব বাক্যের সাহায্যে তাকে বলে দাও মানুষকে সালাতের জন্য আহ্বান জানাতে।" হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হযরত বিলাল (রাঃ) এর আহ্বান শুনে নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এলেন। তাঁর পেছনের পিরহান মাটিতে গড়াচ্ছিল, তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমি একই ধরনের শব্দ শুনেছি যা তিনি উচ্চারণ করেছেন। তিনি বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র জন্যই, কেননা এটি আরও বেশি সত্য।"[৭৪]

মুনাফিকদের উদ্ভব ও ইহুদীদের আচরণ

মুনাফিকদের উদ্ভব

মুসলমানদের আবির্ভাবের পর মদীনার বিকশিত সমাজে মুনাফিকদের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বাহ্যত তারা ছিল সজ্জন কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে দুর্জন। তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের বিধি বিধান পালন করতো কিন্তু তাদের অন্তরে বয়ে বেড়াত কুফরী। তাদের বাহ্যিক আচরণ মুসলমানদের জন্য একটি কঠিন অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। এটি ছিল তাদের জন্য একটি হুমকী। কারণ দুর্বল মানুষেরা মুনাফিকদের মোকাবিলা করতে পারতনা। মুনাফিকদের সম্পর্কে অনেক আয়াত শরীফ নাযিল হয়। দেখা যায় যে, পবিত্র কুরআন শরীফের মাদানী সূরাগুলোতেই শুধু মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে কারণ মক্কায় কোন মুনাফিক ছিলনা। সেখানকার অবস্থা ছিল বিপরীত। সেখানে অনেকে বাহ্যিকভাবে দেখাত যে তারা ইসলামে বিশ্বাস করে না কিন্তু কার্যত তারা মনে মনে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করত। হিজরতের শুরুতে মদীনায় কোন মুনাফিক (কপট বিশ্বাসী) ছিল না। কিন্তু যখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পেল, বিশেষত বদর যুদ্ধে মুসলমানদের ঐতিহাসিক বিশাল বিজয়ের পর মুনাফিকদের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এমন এক দল মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যারা নিজেদের কুফরীকে গোপন করে রেখেছিল। তাদের কিছু সংখ্যক ছিল মদীনার বাসিন্দা আর কিছু ছিল বেদুইন, যারা মদীনার আশে পাশে বাস করত। মুহাজিরদের মধ্যে কোন মুনাফিক ছিলেন না কারণ তারা স্বেচ্ছায় হিজরত করেছিলেন– কোন চাপের মুখে নয়, তাঁরা হিজরত করেছিলেন নিজেদের সহায়-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও মাতৃভূমি ত্যাগ করে শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে পরকালীন পুরস্কার লাভের আশায়। মুনাফিকদের অবস্থান ছিল আউস ও খাজরায গোত্রে যেমন তেমনি ইহুদী এবং অন্যান্য গোত্রেও।

মুনাফিকদের সর্দার ছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলাল। মুনাফিকরা তার কাছে একত্রিত হত। ইসলামের প্রতি তার ঘৃণাবোধ ও আল্লাহর নবী (সাঃ) এর প্রতি তার গোপন লালিত বিদ্বেষের কারণ ছিল এই যে, নবী করীম (সাঃ) এর হিজরতের পূর্বে ইয়াসরিববাসী বুয়াসের যুদ্ধের পর তাকে ইয়াসরিবের (মদীনার) রাজা হিসাবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিল। (কিন্তু নবী করীম সাঃ এর আগমনে মদীনাবাসীর সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজন হয়নি এবং আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের রাজা হওয়ার স্বপ্ন ও সম্ভাবনা ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়-অনুবাদক।) আবদুল্লাহ বিন উবাই-ই সেই ব্যক্তি যে হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর পূত পবিত্র চরিত্রের ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল। সে-ই এ ঘৃণ্য খবর সংগ্রহ করেছিল এবং ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তা রটনা করেছিল। এতে কিছু সংখ্যক মুসলমানের মনেও তার বিরূপ প্রভাব পড়েছিল।

পবিত্র কালামে তার সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ যারা এ অপবাদ রচনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল, একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। ওদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য আছে মহাশাস্তি। (সূরা নূর ২৪ ঃ ১১)

মদীনা হতে ইহুদীদের বহিষ্কার

ইসলামের প্রতি ইহুদীরা যে বিদ্বেষ পোষণ করত বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভের পর তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। বনু নাযিরের সর্দার সালাম বিন মিশকাম আবু সুফিয়ানকে ২০০ জন যোদ্ধাসহ মদীনায় গোপনে প্রবেশে সাহায্য করে। সে তাদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করে, মুসলমানদের খবর সংগ্রহ করার জন্য স্পাই (গোয়েন্দা) পাঠায়। আবু সুফিয়ান তার সাথে একরাত কাটায়। পরে তার দলবলের কাছে গিয়ে সে এক ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে আনসারদের একটি বাগান দখল করে; দু'জন আনসারকে হত্যা করে, বাগানে আগুন লাগিয়ে দেয়, অতপর পলায়ন করে। রাসূল (সাঃ) এ সংবাদ পেয়ে কিছু সংখ্যক মুসলমানকে তাদের পাকড়াও করার জন্য পাঠান। মুসলমানদের ধাওয়া খেয়ে আবু সুফিয়ান তার মূল্যবান সামান, রসদপত্র ফেলে দ্রুত পালিয়ে যায়। তাদের তাড়া করে পেছনে পেছনে মুসলিম যোদ্ধারা ছুটে ছিলেন কিন্তু তাঁরা

শত্রুদের নাগাল পাননি। একে সাভিকের যুদ্ধ বলা হয়।

সালাম বিন মিশকামের এ জঘণ্য অপকর্ম ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) তার জন্য কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করেননি। কেননা সে সময় তাঁকে বনু কায়নুকার এক ষড়যন্ত্রের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়েছিল।

বনু কায়নুকার খপ্পর থেকে মুক্তি

ইহুদীদের মধ্যে বনু কায়নুকা ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির এবং তারা ছিল সবচেয়ে ধনীও। তাই আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) প্রথমে তাদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি তাদের সবাইকে ডেকে জড়ো করলেন এবং তাদের বাজারে উপস্থিত হয়ে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তারা কিন্তু অতি বিশ্রী ভাষায় তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল। তারা বলল ঃ এ চিন্তায় বিভ্রান্ত হবেন না যে, এমন কোন গোত্রের মুখোমুখি আপনি হয়েছেন যারা যুদ্ধ কী জিনিস জানে না আর যাদেরকে আপনি পরাজিত করতে পারবেন (এর দ্বারা তারা বদর যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছিল)। আল্লাহ্‌র কসম যদি আপনি আমাদের সাথে যুদ্ধ করেন তবে অবশ্যই জানতে পারবেন আমরা কেমন সম্প্রদায়।"

তাদের বদগুমান অবস্থা (উদ্ধত আচরণ) দেখে হুজুরে আকরাম (সাঃ) তাদেরকে ছেড়ে আসেন। এদিকে হয়েছে কী, একজন মুসলিম নারী তাদের বাজারে গেলে কতিপয় ইহুদী মহিলা বসা অবস্থায় তাঁর পেছনের কাপড় আলগোছে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে দেয়। মহিলা দণ্ডায়মান হতে গেলে তাঁর শরীরের এমন কিছু অংশ অনাবৃত হয়ে পড়ে যা পর পুরুষের সামনে উন্মুক্ত হওয়া অত্যন্ত লজ্জাজনক; একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারীর জন্য এটি খুবই অপমানজনক। অপমানিত মুসলিম মহিলা লজ্জায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য মুসলমান ভাইদের প্রতি আহ্বান জানান। এতে এক মুসলিম নওজোয়ান দ্রুত এগিয়ে এসে দুষ্কৃতিকারীদের একজনকে কতল করে ফেলে। এতে ইহুদীরা সদলবলে তাকে আক্রমণ করে এবং হত্যা করে। ফলে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) তাদেরকে অবরোধ করে রাখেন। দীর্ঘ ১৫ দিন পর তারা আত্মসমর্পণ করে। তাদের ছিল সাতশ' দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) চাইলে তাদের হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তাদের মিত্র আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল তাদের পক্ষে জোর তদবির ও সুপারিশ শুরু করে দেয় এবং রাসূল (সাঃ) এর কাছে তাদের রক্ষা করার জন্য আবেদন নিবেদন করতে থাকে। এতে রাসূল (সাঃ) তাদেরকে মদীনা ছেড়ে যেতে আদেশ দেন এবং তারা শাম (সিরিয়া) দেশের[১৭] আযরুয়াত এ চলে যায়। এভাবে মদীনা শরীফ ইহুদীমুক্ত হয়।[১৮] বদর যুদ্ধ শেষে হিজরী ২য় বর্ষের শাওয়াল মাসের এক মধ্য শনিবারে এ অবরোধ শুরু হয়।[১৯]

বনু নাযির

ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের এ মর্মে এক ঐতিহাসিক চুক্তি (মদীনা সনদ) সম্পাদিত হয়েছিল যে অনুরুদ্ধ হলে ইহুদীরা মুসলমানদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে এবং সমর্থনের প্রয়োজন হলে সমর্থন করবে। চুক্তির শর্তানুযায়ী মুসলমানদের দেয় রক্ত-পণের অর্থ সংগ্রহের জন্য রাসূল (সাঃ) বনু নাযির গোত্রের কাছে হাযির হন। কিন্তু বনু নাযির গোত্র হুজুরে আকরাম (সাঃ) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। তারা আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) কে একটি দালানের পাশে বসিয়ে এর উঁচু ছাদ থেকে ভারী পাথর ছুঁড়ে ফেলে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালা ওহী মারফত তাঁর হাবীব (সাঃ) কে বনু নাযিরের এ ঘৃণ্য পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেন। এতে রাসূলে করীম (সাঃ) দ্রুত ঘটনাস্থল পরিত্যাগ করেন এবং মুসলমানদের অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। বনু নাযির তাদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং মুসলিম বাহিনী তাদেরকে অবরোধ করে রাখে। তারা ইহুদীদের কিছু বাগানে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে আবদুল্লাহ বিন উবাই বনু নাযিরের সাথে তার মিত্রতার অজুহাতে তাদেরকে মুক্ত অবস্থায় ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে। রাসূলে পাক (সাঃ) এতে সম্মত হন। তিনি তাদেরকে অস্ত্র ছাড়া তাদের উট বহন করতে পারে পরিমাণ ধন সম্পদ নিয়ে যেতে অনুমতি প্রদান করেন। ফলে তারা সাধ্যমত তাদের সম্পদসহ মদীনা ছেড়ে আশ্ শামে চলে যায় এবং মদীনা আর এক গোত্র ইহুদীর কবল থেকে মুক্ত হয়। হিজরী চতুর্থ সালে রবিউল আউয়াল মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[২০]

বনু কোরায়জা

মদীনা হতে বহিষ্কৃত বনু নাযিরের কতিপয় ব্যক্তি কুরাইশদের কাছে গিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্ররোচনা দান করে। কুরাইশরা এতে সম্মত হয়। পরে তারা গাতফান গোত্রের নিকট অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করে। তারাও এতে সাড়া দেয়। কুরাইশ ও গাতফান গোত্র মিলে ১০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হয়। এ সংবাদ নবীজী (সাঃ) এর নিকট পৌঁছলে তিনি মদীনার চারপাশে খন্দক (পরিখা) খননের নির্দেশ দেন। এদিকে হুয়াই বিন আকতাব বনু কোরায়জার পল্লীতে উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানি দেয় এবং অবিশ্বাসীরা মদীনার মুসলমানদের চারদিক থেকে ঘিরে রাখে। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র বড়ই মেহেরবানী (অবশ্যই সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য) যে শত্রুদের মাঝে বিভেদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং তাদের ঐক্য ভেঙে যায়। তিনি আগ্রাসী বাহিনীর ওপর এক প্রচণ্ড ঝড় বইয়ে দেন ফলে তারা তছনছ হয়ে যায়, তারা (পুনঃ) শিবির স্থাপনেও অক্ষম হয়ে পড়ে। ফলে তারা (কুরাইশ যৌথবাহিনী) পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

রাসূল (সাঃ) পরিখার যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বনু কোরায়জার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদের দুর্গ অবরোধ করেন। ২৫ দিন পর তারা আল্লাহ্‌র রসূলের (সাঃ) ফয়সালা মেনে নেয়। তাদের ইচ্ছানুসারে হযরত রাসূলে মকবুল (সাঃ) সা'দ বিন মোয়াজের ওপর তাদের বিচার ফয়সালার ভার দেন। সা'দ বিন মোয়াজ বনু কোরায়জার পুরুষকে হত্যার, নারী ও শিশুদের বন্দী করার রায় প্রদান করেন। রায় কার্যকর হলে তাদের নারী, শিশু ও সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এভাবে মদীনা মুনাওয়ারাহ আরেক গোত্র ইহুদীবসতি মুক্ত হয়। হিজরী পঞ্চম বর্ষের জিলকদ মাসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়।[২৯]

মসজিদে নববী নির্মাণ ও যুগ পরম্পরায় এর সংস্কার

নবীর যামানা

নবী করীম (সাঃ) মদীনায় পৌঁছে বনু আমর বিন আওফের অংগনে ১৪ রাত অতিবাহিত করেন। যখন যেখানে নামাযের ওয়াক্ত হত সেখানেই তিনি তা আদায় করে নিতেন। অতপর তিনি একটি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। এ উদ্দেশ্যে বনু নাজ্জারের এক সমাবেশে তিনি একটি বাণী পাঠান। তাতে তিনি বলেন ঃ "হে বনু নাজ্জার! যথোপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে তোমাদের এ জমিটুকু আমাকে প্রদান কর।" কিন্তু তারা বলল, "আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা আল্লাহ্‌র কাছে ছাড়া এর কোন বিনিময় চাই না।" হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ ঐ জমিতে বৃক্ষ ছিল আর ছিল মুশরিকদের কবর ও ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বৃক্ষ কেটে ফেলতে, কবর খুঁড়ে ফেলতে ও ধ্বংসাবশেষ গুলো সমান করে দিতে হুকুম দিলেন। লোকজন কিবলামুখী হয়ে বৃক্ষগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজাল এবং দরজার উভয় পার্শ্বে পাথর স্থাপন করল। এভাবে মসজিদ নির্মাণের সময় তারা সমবেত কণ্ঠে রাজাজ[৩০] আবৃত্তি করছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে সাহাবারা পড়ছিলেন ঃ

হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই। অতএব আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দিন।"

সালামা বিন আল আকওয়া (রাঃ) বলেন– মসজিদের দেয়াল থেকে মিম্বর পর্যন্ত এক বকরীর চলাচলের সমান দূরত্ব ছিল। যে জমির ওপর মসজিদ নির্মিত হয়েছে তা ছিল দু'জন এতিম বালকের বাসগৃহ। তারা আসাদ বিন জুরারাহ'র তত্ত্বাবধানে ছিল।"

হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর হাবীব (সাঃ) তাঁর সওয়ারীর ওপর উপবিষ্ট ছিলেন, একসময় পশুটি হাঁটু গেড়ে মসজিদের স্থানে বসে পড়ল, সে স্থানটি ছিল সহল ও সুহাইল নামক দু'জন এতিম বালকের বসতভূমি। তারা দু'জনই আস'আদ বিন জুরারাহ'র হেফাজতে ছিল। যখন পশুটি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এটিই নির্ধারিত স্থান।' তখন তিনি সে বালক দু'টিকে ডেকে পাঠালেন, দাম দিয়ে জমিটুকু মসজিদের জন্য কিনে নিতে চাইলেন। কিন্তু তারা বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমরা এ জমি আপনাকে বিনামূল্যেই দেব।" তবুও রাসূলে পাক (সাঃ)

দেড়শত বছর পূর্বে শিল্পীর কাষ্ঠ খোদাই চিত্রে মদীনা শরীফ

এতিমদ্বয়ের জমির উপযুক্ত মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করলেন। তারপর তিনি মসজিদ নির্মাণ করলেন এবং নির্মাণকারীদের সাথে নিজেই ইট (পাথর) বহন করেছিলেন। তিনি এরশাদ করলেন ঃ

"এ কাজ খাইবারের কাজ নয়, এটি আরও অধিক পুণ্যের, আরও অধিক পবিত্রতার হে, আমাদের প্রভু!"

আরও বললেন ঃ "হে আল্লাহ্! আখিরাতের পুরস্কারই হল আসল পুরস্কার। অতএব আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি আপনি রহম করুন।"[১]

হযরত নাফি (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) তাঁকে বলেছেন- আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর যামানায় কাঁচা ইট দিয়ে মসজিদটি তৈরি হয়েছিল, এর ছাদ ছিল খেজুর পাতার এবং এর খুঁটিগুলো খেজুর গাছের কাণ্ড দ্বারা নির্মিত।[২]

আসহাবে সুফ্ফা

আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচার ও বিজয়ী করার দুর্দম মিশন নিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম শুরু করেন ইসলাম প্রচার। অজ্ঞতা, অসত্য, অসুন্দর ও বিশৃংখলার স্থলে ইসলামের শাশ্বত বিধান কায়েমের লক্ষ্যে মহানবী (সাঃ) নবুয়তের বন্ধুর পথে পা বাড়ান। ইসলামের পথে রাসূল (সাঃ) এর দাওয়াতী মিশন যতই দ্রুত গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছিল, বাধার পাহাড় ততই রুদ্ধ করে দিচ্ছিল সে পথ। এমনি এক সমস্যা সংকুল পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) পবিত্র মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন। তাঁর জন্য উৎসর্গপ্রবণ সাহাবায়ে কেরামগণ স্বেচ্ছায় কবুল করে নেন এই হিজরতকে। সেই মুহাজির সাহাবীগণের মধ্যে এমন কতিপয় গরীব সাহাবীও ছিলেন যাঁরা হিজরতের পর হতেই রাসূলে পাকের দরবারে, মসজিদে নববীর আঙ্গীনায় সদা সর্বদা পড়ে থাকতেন। যাঁদের কর্ম ছিল রাসূলে পাক (সাঃ) এর পবিত্র বাণী শ্রবণ, সংরক্ষণ ও তা মানুষের নিকট পৌঁছানো। এমন আত্মত্যাগী ও রাসূলে পাক (সাঃ) এর একনিষ্ঠ এই সাহাবীগণ "আহলে সুফ্ফা" নামে সুপ্রসিদ্ধ। পবিত্র হাদিসের ভাষায় তাঁদেরকে 'আসহাবে সুফ্ফা'ও বলা হয়।

(১) আহলে সুফ্ফা হচ্ছেন ঐ সব দরিদ্র সাহাবী যাঁরা মসজিদে নববীর বারান্দায় বসবাস করতেন।

(২) হযরত ইব্‌নে আকরামা (রাঃ) বলেন, মসজিদে নববী শরীফের উত্তর দিকে একটি চত্বর ছিল, সেই চত্বরে যে সব সাহাবায়ে কেরাম বসবাস করতেন, তারাই আহলে সুফ্‌ফা নামে পরিচিত।

(৩) কেউ কেউ তাঁদের পরিচয়ে বলেন, জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে যে সকল সাহাবী আপন গৃহ ত্যাগ করে মসজিদে নববীর বারান্দায় সর্বদা পড়ে থাকতেন, তাঁদেরকে আহলে সুফ্‌ফা বলা হয়।

এক কথায় বলা যায়, মদীনা শরীফে মসজিদে নববীর আশেপাশে কয়েকজন দরিদ্র মুহাজির মুসলমান অবস্থান করতেন। ঘর বাড়ি কিছুই ছিল না তাঁদের। একেবারে নিঃস্ব ও সম্বলহীন। বিয়ে, ঘর-সংসার পর্যন্ত করেননি তাঁরা। নবী প্রেমে উদ্ভাসিত মন নিয়ে তাঁরা মহান আল্লাহ্‌কে পরম নির্ভর মেনে ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন সদা। আর সব সময় উৎসুক থাকতেন মহানবী (সাঃ) এর বাণী শ্রবণে।

তফসীরে বায়যাভী, তফসীরে জালালাইন, তফসীরে সা'বীসহ অনেক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, আহলে সুফ্‌ফার সদস্য সংখ্যা প্রায় চারশত জন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, তাদের সংখ্যা সত্তর জন কিংবা আশি জন; তাঁদের মধ্যে সত্তর জন এমন অভাবী ছিলেন যে, পূর্ণ শরীর ঢাকার কাপড়ও তাঁদের ছিল না।

আসহাবে সুফ্‌ফার কতিপয় সাহাবীর নাম :

রওজা পাক বরাবর উত্তর পাশে বাবে নিসার পশ্চিম দিকে অবস্থিত আসহাবে সুফ্‌ফার পবিত্র বাসস্থান

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), ২. হযরত মুহাম্মদ মুখতার বেলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ), ৩. হযরত আবু আব্দুল্লাহ সালমান ফারসী (রাঃ), ৪. হযরত আবু উবায়দাহ আমের ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জুরাহ (রাঃ), ৫. হযরত আবুল ইয়াকতান আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ) ৬. হযরত আবু মাসউদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ইয়াযালী (রাঃ), ৭. হযরত উতবা ইবনে মাসউদ (রাঃ), ৮. হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ), ৯. হযরত হবাব ইবনে আরাত্ত (রাঃ), ১০. হযরত ইবনে ছেনান (রাঃ), ১১. হযরত উতবা ইবনে গযওয়ান (রাঃ), ১২. হযরত যাইদ ইবনে খাত্তাব (রাঃ) [হযরত ওমর (রাঃ) এর ভাই], ১৩. হযরত আবু কাবশী (রাঃ), ১৪. হযরত আবুল মুরছেদ কেনানা ইবনে মুহসিন আদভী (রাঃ), ১৫. হযরত হাদিকাতুল ইয়ামানী (রাঃ), ১৬. হযরত উকাশা ইবনুল মুহসিন (রাঃ), ১৭. হযরত মাসউদ ইবনে রবিউল ক্বারী (রাঃ), ১৮. হযরত আবুজার জুনদব ইবনে জানাদুতাল গিফারী (রাঃ), ১৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), ২০. হযরত সাফওয়ান ইবনে বায়দারী (রাঃ), ২১. হযরত আবু দারদা আ'বিয়ম ইবনে আমের (রাঃ), ২২. হযরত আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মনজর (রাঃ), ২৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বদরুল জুহনী (রাঃ), ২৪. হযরত ছাওবান (রাঃ), ২৫. হযরত মুয়াজ ইবনে হারেছ (রাঃ), ২৬. হযরত সাত্তান (রাঃ), ২৭. হযরত খালাব (রাঃ), ২৮. হযরত ছাবেত ইবনে ওয়াদীয়ত (রাঃ), ২৯. হযরত আবু ঈসা আবিয়াম ইবনে মুস'আদ (রাঃ), ৩০. হযরত সালেম ইবনে ওমর ইবনে সাবেত (রাঃ), ৩১. হযরত আবুল লাইস কাব ইবনে ওমর (রাঃ), ৩২. হযরত ওয়াহাব ইবনে মোয়াকুল (রাঃ), ৩৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আনিস (রাঃ), ৩৪. হযরত হাজ্জাজ ইবনে আসলামী (রাঃ), ৩৫. হযরত আবুল ইয়াকতান আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ), ৩৬. হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ), ৩৭. হযরত সোহাইব রুমী (রাঃ), ৩৮. হযরত সালেম (রাঃ) [যিনি হযরত আবু হুযাইফা (রাঃ) এর মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন], ৩৯. হযরত ছহীব (রাঃ) [যিনি উসায়েদের মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন], ৪০. হযরত মিকদাদ ইবনে আমর (রাঃ), ৪১. হযরত যুশ-শিমালাইন (রাঃ) প্রমুখ।

মদীনার জীবন-চিত্র

রাসূলে পাক (সাঃ) কর্তৃক নির্মিত মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করেই প্রতিষ্ঠিত পবিত্র মদীনা নগরী। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনার বাদশাহ। না; তার জন্য কোন রাজপ্রাসাদ নেই– নেই কোন মন্ত্রণালয়। সচিবদের জন্যও নেই কোন আলাদা সচিবালয়। সুবিশাল মুজাহিদ বাহিনী! যারা নবীজীর একটু ইশারায় নিজেদের জীবনবাজী রেখে রাতকে দিন, দিনকে রাত করে দিতে পারে; সংখ্যায় নগন্য হলেও ৩ গুণ

শত্রু বাহিনীর বুহ্য ভেদ করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারে, তাদের সেনানিবাস কোথায়? কোথায় তাদের অস্ত্রাগার? আল্লাহর আইনের প্রয়োগে দু'নিয়া যেখানে বেহেশতে পরিণত হয়েছে, কোথায় সেই হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট?

এ সবই এই মসজিদে নববীতে। এই মসজিদকে কেন্দ্র করেই দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামিক রাষ্ট্র; কায়েম হয়েছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন। সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির সহজ-সরল মানব জীবন।

বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর সোনার মদীনার জীবন-চিত্র বিশ্বনন্দিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী (রাহঃ) ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে :

বাদ ফযর। মাত্র দিন হল। লোকজন মসজিদে নববী হতে শান্ত ও গাম্ভীর্যের সাথে ফিরছে। তবে তারা চঞ্চল, তৎপর। এখানে বাজারে দু'একটি দোকান খোলা হচ্ছে। ওখানে ক্ষেতে দু'একজন কৃষক নেমেছে। এটি একটি খেজুর বাগান, এতে পানি সিঞ্চন করা হচ্ছে। উনি একজন দিনমজুর। মজুরির বিনিময়ে একটি বাগানে কাজ করছেন। সন্ধ্যায় মজুরি গ্রহণ করবেন। তারা সবাই নিজ নিজ কাজে ছুটে গেছে। কারণ, হালাল উপার্জন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণের ফজিলত তারা শুনেছে।

"তোমরা তাদেরকে দেখবে– কাজে-কর্মে তারা সুচতুর, আল্লাহর যিকিরে তাদের রসনা সিক্ত, সওয়াব ও প্রতিদান অন্বেষণে তাদের মন সদা প্রস্তুত। তাদের পার্থিব কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা এ পরিমাণ, যে পরিমাণ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আজকের নামায নিবেদিত। তাদের দেহ কর্মে নিয়োজিত, আর মন আল্লাহর প্রতি ধাবিত।"

মুয়াজ্জিন মাত্র আজান দিল। সাথে সাথেই তারা যে কাজে রত ছিল তা থেকে নিজেদের হাত ঝেড়ে নিল। যেন এর সাথে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। সে সব লোকেরা মসজিদ অভিমুখে দ্রুত ছুটল :

রিজালুল লা তুলহীহিম তিজারাতুঁ ওয়ালা বাইয়ুন আন যিকরিল্লাহ ওয়া ইকামিচ্ছালাতি ওয়া ইতায়ীয্‌যাকাতি, ইয়াখাফুন ইয়ামান্ তাতাকাল্লাবু-ফীহিল কুলুবু ওয়াল আবছার। (সূরা নূর)

"যাঁদেরকে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে অমনোযোগী করতে পারে না; তারা সে দিনের আশংকায় থাকে যে দিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি উল্টে যাবে (তারা আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে)।"

নামায শেষ করা মাত্রই তারা জমিনে ছড়িয়ে পড়েছে; আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করার লক্ষ্যে এবং তাঁকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে। সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঝুঁকল, তখন তারা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরল। পরিবার-পরিজনের সংগে সাক্ষাত করল এবং তাদের সামনে বসল। আল্লাহর পক্ষ হতে প্রতিদান ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাদের সংগে কথা বলছে। কোমল আচরণ করছে এবং তাদেরকে অন্তরঙ্গ করছে। এশার নামাযের পর ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ দেখি কি! শেষ রাতে ওরা ওদের প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় তারা গুনগুন্ করছে এবং তাদের বুক উনুনে হাঁড়ির ভেতর ভাতের মাড় ফোটার ন্যায় ফুটছে। ফজর নামাযের পর তারা সৈনিকের উদ্যম ও শক্তিসহ নিজ নিজ কাজের প্রতি একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করছে; যেন দিনে তারা ক্লান্ত হয়নি এবং রাতেও জাগ্রত থাকেনি।

মসজিদে যিকির ও ইলমের আসরগুলো দেখো, তাতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক একত্র হয়েছে। ইনি ঐ কৃষক যাকে দিনে তুমি ক্ষেতে দেখেছ। ইনি ঐ দিনমজুর যাকে বালতি টেনে এক ইহুদির বাগানে খেজুরগাছ সিঞ্চন করতে দেখেছ। ইনি ঐ ব্যবসায়ী যাকে মদীনার বাজারে পণ্য বিক্রি করতে দেখেছ। আর ইনি ঐ কারিগর যাকে তুমি তার পেশায় নিয়োজিত পেয়েছ। এখন তারা তালিবুল্ ইলম (ইলম অন্বেষণকারী) ব্যতীত আর কিছুই নয়। তারা বিশ্রাম বর্জন করেছে; অথচ দিনের ব্যস্ততার পর তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। নিজেদের পরিবার-পরিজন বাড়িতে রেখে এসেছে; অথচ তারা তাদের আল্লাহর হাওলা করে জ্ঞান অন্বেষণে ছুটেছে মদীনার পানে। কারণ, তারা শুনেছে– **ইন্নাল্ মালায়িকাতা লাতাছাউ আজ্‌নিহাতাহা লি তা'লিবিল ইলমে রিদাম বিমা ছনাআ।** (আল-হাদিস)

"অবশ্যই ফিরিশতাগণ ইল্‌ম অন্বেষণকারীর সম্মানে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন, ইল্‌ম অন্বেষণকারীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে।"

এবং এ কারণেও যে, তারা শুনেছে– **লা-ইয়াকুউদু কাউমুন ইয়াযকুরূনাল্লাহা ইল্লা হাফ্‌ফাতহুমুল মালাইকাতু ওয়া গাশিয়াতহুমুর রাহমাতু ওয়া নাযালাত্ আলাইহি মুচ্ছাকীনাতু ওয়া যাকারাহুমুল্লাহ্ ফি মান্ ইনদাহু।** (আল-হাদিস)

"যারাই আল্লাহ্‌র যিকিরের উদ্দেশ্যে (কোন স্থানে) বসে, ফিরিশতাগণ তাদেরকে ঘিরে নেন। রহমত তাদেরকে ছেয়ে নেয়। তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং যারা আল্লাহর সন্নিকটেই আছে, আল্লাহ তাদের মাঝে তাদের আলোচনাই করেন।"

তুমি তাদেরকে নবীজীর সামনে অত্যন্ত নীরব দেখবে, তাদের মাথার উপর পাখি উড়ে গেলেও খবর নেই। তারা বিনয়ী ও উন্মুখ, যেন অহী অবতীর্ণ হচ্ছে।

হাত্তা ইযা ফুয্‌যিআ আন্ কুলুবিহীম-ক্বালু-মা'যা? ক্বালা রাব্বুকুম? ক্বালুল-হাক্কা, ওয়া হুয়াল্-আলিয়্যুল কাবীর। (সূরা-সাবাহ্)

"পরে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হয় তখন তারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে–তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? তদুত্তরে তারা বলে– যা সত্য তিনি তা-ই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান।"

ইল্‌ম ও বিনয় প্রতিযোগিতা করে। জানা যায় না, কোনটি অগ্রগামী। ভাব অন্তরের দিকে ও শব্দ কানের দিকে 'কে কার আগে' এই মনোভাবে অগ্রসর হয়। বুঝা যায় না, কোনটি দ্রুততর।

অনেকে পালাক্রমের উপর একমত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কেউ রাসূলের মজলিসে অনুপস্থিত থাকলে তার পরিবর্তে প্রতিবেশী বা তার ভাই উপস্থিত থাকে। এভাবে প্রথমজন মজলিসে যে হাদীস আলোচনা হয় বা যে আয়াত অবতীর্ণ হয় তা হৃদয়ঙ্গম করে দ্বিতীয়জনকে অবহিত করে।

এঁরাই ছাত্র। এঁরা ইলমের নিরবচ্ছিন্ন অন্বেষণকারী। রাত যখন তাদেরকে ঢেকে ফেলে তখন তারা মদীনায় মসজিদে নববীতে অবস্থানকারী একজন শিক্ষকের কাছে ছুটে যায় এবং রাতভর পড়াশুনা করে। সকাল বেলা যার শক্তি থাকে সে মিষ্টি পানির খোঁজে বের হয় এবং লাকড়ি সংগ্রহ করে। আর যাদের সামর্থ থাকে তারা একত্র হয়ে বক্‌রি কিনে এবং তা ভক্ষণ উপযোগী করে। অতঃপর তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরাগুলোর (উম্মাহাতুল মুমিনীনের কামরা) সংগে লটকানো থাকে।

মদীনার প্রত্যেকেই হালাল-হারাম এবং স্বীয় জীবন, পেশা ও চাকুরী সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত। নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য যতটুকু কুরআন মুখস্থ থাকা অত্যাবশ্যক ততটুকু কুরআন মুখস্থ পারে। তাছাড়া তারা ইল্‌ম অন্বেষণে নিরবচ্ছিন্ন, নিরলস। বিধি-বিধানের তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মের দৃঢ়তা ও বদ্ধমূলতা, আমলের আগ্রহ ও নিষ্ঠা, আখেরাতের প্রতি ব্যকুলতা ও সাওয়াবের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যহ তাদের বাড়ছে। তাদের ফজিলত ও দ্বীনের মূলনীতি সংক্রান্ত জ্ঞান, মাসআলা-মাসায়েল ও শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত জ্ঞানের তুলনায় বেশী তাদের অন্তর সর্বাধিক পুণ্যবান; ইলম সবচে' গভীর এবং লৌকিকতা সবচে' কম।

তাদের কেউ যখন দ্বীনের কোন জ্ঞান অর্জন করে তখন নিজের ভাইদের দিকে দ্রুত ছুটে যায়। তাদেরকে তা শিক্ষা দান করে। কেননা তারা নবীজীর পবিত্র মুখে শুনেছেন–

আলা-ফাল ইউবাল্লিগিশ্ শাহিদুল্ গায়িবা-ফারুব্বা মুবাল্লাগিল আউআ মিন ছা'মিয়ীন।
(আল-হাদিস)

"জেনে রাখ, উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট (আমার বাণী) পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ, কোন কোন এমন ব্যক্তি রয়েছেন যার নিকট পৌঁছানো হয় শ্রোতা অপেক্ষা তিনি অধিক সংরক্ষণকারী হয়।"

তাঁরা তাঁদের নবীজীকে বলতে শুনেছেন– **ইন্নামা বুয়িসতু মুয়াল্লিমান্।** (আল-হাদিস)

হয়না। ফলে অনেক মুসল্লীকে মসজিদের বাইরে নামায পড়তে হয়।

খলিফাতুল মুসলেমিন হযরত উসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রবীন ও বিজ্ঞ সাহাবীদের নিয়ে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে মসজিদ ভেঙে পুনঃনির্মাণের ও সম্প্রসারণের জন্য মত দিলেন। ফলে তিনি যোহরের জামায়াতে হাযির হয়ে নামায শেষে মিম্বরে আরোহণ করলেন। প্রথমে তিনি মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় ও তাঁর প্রশংসা করলেন। তাঁর প্রতি জানালেন সবিনয় কৃতজ্ঞতা। তারপর বললেন ঃ হে লোক সকল! আমি মসজিদে নববী ভেঙে তা পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণ করতে চাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ 'যে কেউ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।' মসজিদ সম্প্রসারণে আমার জন্য পূর্বদৃষ্টান্তও রয়েছে। এ বিষয়ে একজন ইমাম আমার অগ্রণী। হযরত ওমর বিন আল খাত্তাব (রাঃ) এর সম্প্রসারণ করেছেন, একে পুনঃনির্মাণ করেছেন, আমি রাসূলে করীম (সাঃ) এর বিজ্ঞ সাহাবাগণের পরামর্শ গ্রহণ করেছি এবং তাঁরা একে ভেঙে পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য রায় দিয়েছেন।"

উপস্থিত লোকজন তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। পর দিন প্রভাতে তিনি নির্মাণ শ্রমিকদের নিয়ে এলেন এবং নিজেই কাজে অংশ গ্রহণ করলেন। মসজিদে এমন একজন লোক ছিলেন যিনি দিনে রোজা রাখতেন, রাতভর ইবাদত করতেন এবং মসজিদ ছেড়ে কোথাও যেতেন না। খলিফা চাঁছে ঢেলে প্লাস্টার নির্মাণের ও গাছের ফাঁপা গুড়িতে ভরে তা তৈরি করার জন্য নির্দেশ দিলেন। ২৯ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি কাজ শুরু করেন ৩০ হিজরীর পবিত্র মুহাররমের নতুন চাঁদ উদিত হলে তিনি নির্মাণ কাজ শেষ করেন। ফলে ১০ মাসে মসজিদের পুনঃনির্মাণ কাজ শেষ হয়।[৮৭]

আল ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের আমলে

হযরত উমর বিন আবদুল আযিয (রাহঃ) ছিলেন মদীনায় খলিফা আল ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের প্রতিনিধি। খলিফা তাঁকে মসজিদ পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। নির্দেশানুসারে হযরত উমর বিন আবদুল আযিয (রাহঃ) ৮৮ হিজরীতে মসজিদ পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু করে ৯১ হিজরীতে তা শেষ করেন। তিনি পশ্চিম দিকে ২০ হাত এবং পূর্ব দিকে ৩০ হাত সম্প্রসারণ করেন। উম্মুল মোমেনিনগণের (রাঃ) হুজরা শরীফকে (হযরত আয়িশা, সওদা, হাফ্‌সা, যয়নব, উম্মে সালমা, যয়নব বিনতে জাহাশ, উম্মে হাবিবাহ, যুভারিয়াহ, সাফিয়া ও মাইমুনা রাঃ এর কুটিরকে) তিনি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি মসজিদের উত্তর সীমানাও বর্ধিত করেন। তিনি নির্মাণ কাজে পাথর ব্যবহার করেন এবং ফাঁপা পাথরের অভ্যন্তরে লোহা ও সীসা ব্যবহার করেন। তিনি মসজিদের জন্য দুটো ছাদ নির্মাণ করেন, একটি উপরের ও একটি নিচের। নিচের ছাদটি ছিল চন্দন কাঠের তৈরি। আল ওয়ালিদের আমলে হযরত উমর বিন আবদুল আযিযের (রাহঃ) হাতে মসজিদে নববীতে সর্বপ্রথম মিনার সংযোজিত হয়। ইবনে জাবালা ও ইয়াহিয়া মুহাম্মদ বিন আম্মার থেকে এবং তিনি তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন ঃ হযরত উমর বিন আবদুল আযিয (রাহঃ) যখন মসজিদে নববী পুনঃনির্মাণ করেছিলেন তখন তিনি এর চার কোণায় চারটি মিনার সংযোজন করেন।[৮৮]

দেড়শত বছর পূর্বে সমদীনা শরীফ সংলগ্ন একটি মার্কেট

এই সম্প্রসারণ কালে মসজিদে মেহরাবও সংযোজিত হয়। অভ্যন্তরীণ দেয়ালে সৌন্দর্যবর্ধক বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশাও অংকন করা হয়। তাতে মার্বেল পাথর, স্বর্ণ এবং মোজাইকও ব্যবহার করা হয়। ছাদ ও স্তম্ভের উপরিভাগ স্বর্ণমণ্ডিত করা হয়, দরজার উপরে চৌকাঠ লাগানো হয় এবং মসজিদের ২৪টি দরজা রাখা হয়।

আল মাহদী, আব্বাসীয় আমলে (১৬১-১৬৫ হিঃ)

আল মাহদী বিন আবি জাফর ১৬১ হিজরীতে হজ্ব করেন। হজ্বের পর তিনি মদীনা শরীফে আগমন করেন। ১৬১ হিজরীতেই তিনি জাফর বিন সুলাইমানকে মদীনার গভর্ণর নিয়োগ করেন এবং তাঁকে মসজিদে নববী সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। জাফর বিন সুলাইমান (গভর্নর) সম্প্রসারণ কাজের

ইনচার্জ (তত্ত্বাবধায়ক) ছিলেন। তাঁর দু'জন সহযোগী ছিলেন আসিম বিন উমর বিন আবদুল আযিয (রাহঃ) এবং আবদুল মালিক বিন আবদুল আযিয গাস্‌সানী (রাহঃ)। তাঁরা মসজিদটির উত্তর প্রান্ত সম্প্রসারণ করেন। তিনি আশে পাশের গৃহগুলির মূল্য নির্ধারণ করেন ও তা যথাযথ মূল্যে কিনে নেন। হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) এর গৃহটিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। একে বলা হত দার আল মালাইকা (ফিরিশতার নিবাস)। হযরত শুরাহবিল বিন হাসানাহ (রাঃ) এর গৃহের ভিটিও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এর ঘরের বাকী অংশ যা দারুল কোররা (ক্বারীদের আবাস) নামে অভিহিত ছিল তাও মসজিদের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়।[৮৭]

কুয়েতবে এর আমলে (৮৮৬-৮৮৮ হিঃ)

৬৫৬ হিজরীতে আব্বাসীয় খিলাফতের অবসানে মদীনা মুনাওয়ারার দায়িত্বভার মিশরের বাদ্‌শাহ্‌র ওপর বর্তায়। এ 'বুজর্গ মসজিদের' যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে মিশরের বাদ্‌শাহ্‌গণ বরাবরই উৎসাহী ছিলেন। সবচাইতে গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করেন সুলতান কুয়েতবে। ৮৮৬ হিজরীর (১৪৮১ ঈসায়ী সাল) ১৩ রমজান মসজিদে নববী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সুলতান কুয়েতবে এর দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করেন। ৮৮৮ হিজরীর রমজান মাসে এর সম্পূর্ণ মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়। তিনি মসজিদের পূর্বাংশ বর্ধিত করেন যা ছিল আড়াই হাত দূরবর্তী এনক্লোজারের উল্টোদিকে। তিনি ২২ হাত উঁচুতে মসজিদের একটি একক ছাদও নির্মাণ করেন।[৮৮]

সুলতান আবদুল মজিদের আমলে

৯২৩ হিজরীতে (১৫১৭ ঈসায়ী সাল) মিশরে মামলুক রাজত্বের অবসান ঘটে। এরপর পবিত্র মসজিদে নববীর দায়িত্ব বর্তায় (তুরস্কের) উসমানীয় খলীফাগণের ওপর। সুলতান কুয়েতবে কর্তৃক মসজিদ সংস্কারের পর ৩৭০ বৎসর কেটে যায়। এর পর মসজিদের কোথাও কোথাও ফাটল পরিদৃষ্ট হয়। এ সময় পবিত্র মসজিদে নববীর শায়খ ছিলেন দাউদ পাশা। তিনি মসজিদের আশু মেরামতের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে সুলতান আবদুল মজিদ ১ম কে পত্র লিখেন। সুলতান একজন বিশ্বস্ত লোকসহ একজন দক্ষ প্রকৌশলী প্রেরণ করেন। এটি ১২৬৫ হিজরীর ঘটনা। মসজিদের পুনঃনির্মাণ ও এর নবতর নকশা করণে কী ধরনের পদক্ষেপ ও কার্যক্রম হাতে নেয়া যায় সে বিষয়ে তাঁরা মদীনাবাসীর সাথে আলাপ আলোচনা করেন। প্রতিনিধি দল ইস্তাম্বুলে ফিরে গিয়ে সুলতান আবদুল মজিদকে মসজিদের পুনঃনির্মাণ ও নবতর নকশা করণে কী কী করণীয় সে বিষয়ে অবহিত করেন। সব শুনে সুলতান আবদুল মজিদ বিষয়টিকে খুবই গুরুত্বের সাথে নেন। নির্মাণ কাজ পরিচালনা ও তদারকি করার জন্য তিনি হালিম আফান্দীকে প্রেরণ করেন। সাথে দেন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, টাকা-পয়সা, একদল বিশেষজ্ঞ পাথর মিস্ত্রি, নির্মাণ শ্রমিকসহ যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম।

প্রকৌশলী হালিম আফান্দী মদীনার নিকটবর্তী এই 'আল হারাম' পাহাড় খনন করে যে লাল পাথর পান তা দিয়েই মসজিদে নববীর মূল ভবন নির্মাণ করেন

বিশেষজ্ঞ দল মদীনায় পৌঁছে পাহাড়ে খনন কার্য শুরু করেন। তাঁরা (জবল আল-হারাম নামক) একটি পাহাড়ে বিপুল পরিমাণ লাল পাথরের সন্ধান পান যা অন্যান্য অনেক কাজের সাথে অলংকার তৈরিতেও ব্যবহার করা হয়। খনি থেকে পাথরগুলো তুলে এনে তাঁরা মসজিদ প্রাঙ্গণে জমা করেন। তাঁরা একযোগে সমস্ত মসজিদ না ভেঙে এক এক অংশ এক এক বার ভেঙে তা পুনঃনির্মাণ করেন যাতে মুসল্লীদের নামায আদায়ে কোন অসুবিধা না হয়।
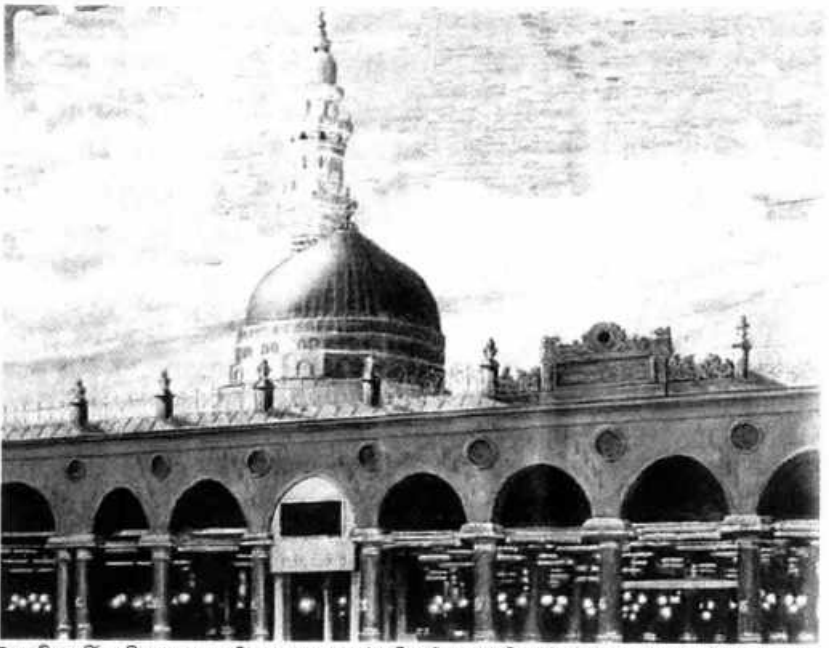
উসমানী (তুর্কী) খলীফা আবদুল মজিদের আমলে প্রকৌশলী হালিম আফান্দী কর্তৃক নির্মিত মসজিদে নববীর মূল অংশ। প্রায় ৭০ বছর পূর্বে তোলা ছবি। যান্ত্রিক ক্রুটির কারণে গম্বুজের রঙ যথাযথ হয়নি।

তাঁরা পুরো মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করেন। শুধু রওজা মোবারক, পশ্চিমের দেয়াল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মেহরাব, হযরত উসমান (রাঃ) এর মেহরাব, সুলাইমানের মেহরাব এবং প্রধান মিনার তাঁরা অক্ষত রাখেন। কারণ এগুলোর নকশা ছিল নিখুঁত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। এতে নকশাবিদ অতুলনীয় সাফল্য লাভ করেন। মসজিদের পুরো মেঝে মার্বেল পাথর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় এবং কিবলার দিকের দেয়ালের নিম্ন অর্ধাংশেও মার্বেল পাথর লাগানো হয়। মূল ভবনের পুনঃনির্মাণ শেষে পিলার সমূহকে বার্নিশ করা হয় এবং সেগুলো এমনভাবে রং করা হয় যাতে পাথরের রংয়ের সাথে মিলে যায়। নানা নকশায় গম্বুজগুলো চমৎকারভাবে চিত্রিত করা হয়। 'রিয়াজুল জান্নাত' যাকে বেহেশতের টুকরো (অংশ) বলা হয় - তার পিলারসমূহ সাদা ও লাল মার্বেল পাথর দিয়ে মুড়িয়ে দেয়া হয়, যাতে এ স্থানটিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। এ সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে তিন বৎসর সময় ব্যয় হয়।

মসজিদের অভ্যন্তরে একটি দরজা রাখা হয়। এর নাম রাখা হয় 'আল-বাব আল মজিদি।' সৌদী পুনঃনির্মাণের সময় এটিকে সরিয়ে উল্টো দিকে স্থাপন করা হয়, এখনও পর্যন্ত তা পূর্ব নামেই পরিচিত। মসজিদের পেছনের অংশের ভিটি সামনের অংশ থেকে উঁচু ছিল। সুলতান আবদুল মজিদের সময় পুরো মেঝেটাই একই সমান করা হয়। মিনারের ভিত পানির লেভেল থেকে আরও গভীরে স্থাপন করা হয় এবং সেখানে শীলা ও কালো পাথর বসানো হয়। ১২৭৭ হিজরীতে নব নির্মাণের এই কাজ শেষ হয়। এর স্থাপত্য শৈলী ও নান্দনিকতা এখনো একক বৈশিষ্ট্য রূপে বিদ্যমান। যে কেউ এর মিম্বর, মেহরাব, ফ্লোর, পিলার ও গম্বুজের দিকে– ভেতরে বা বাইরে তাকাবে, সেখানেই তার চক্ষু স্থির হয়ে রইবে; মানব হস্তের এ সৌন্দর্যময় কারুকাজ কল্পনাকেও হার মানায়।

সৌদী সম্প্রসারণ কালে নিখুঁত বৈশিষ্ট্য ও অপূর্ব সুন্দর নান্দনিকতার জন্য সুলতান আবদুল মজিদের পুনঃনির্মিত মসজিদে নববীর দক্ষিণ ব্লক অবিকৃত ও অক্ষত রাখা হয়। এর আয়তন হচ্ছে ৪,০৫৬ বর্গ মিটার।

সৌদী আমলে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ

মসজিদে নববীর মূল ভবন ও রওজা-এ-রাসূলে পাক (সাঃ) এর ওপর সৌদী আমলের নির্মাণ শৈলী

প্রথম সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণ

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সৌদী সরকার দুই পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষন, সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য বর্ধনে গভীর আগ্রহ ও মনোযোগ প্রদর্শন করেন। পবিত্র কাবা শরীফ ও মদীনা শরীফের সম্প্রসারণে তাঁরা যে কার্যক্রম গ্রহণ করেন তাতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৩৬৮ হিজরীর রমজান মাসে (১৯৫১ ঈসায়ী সাল) বাদশাহ আবদুল আজীজ আল সৌদী (রাহঃ) পবিত্র মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ করার ইচ্ছা ঘোষণা করেন। একই বছর এর প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। শুরুতেই মসজিদে নববীর পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরাংশের ভূমিতে নির্মিত অবকাঠামোসহ দোকানপাট, ঘরবাড়ি ক্রয় করে স্থাপনাগুলো অপসারণ করা হয়। মসজিদ ও এর আশেপাশের রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য ভূমি ভরাট ও সমতল করা হয়। মসজিদের উত্তর প্রান্তে স্থাপিত মজিদি বিল্ডিংয়ের ছাদ সংলগ্ন গ্যালারী ভেঙে ফেলা হয়। এর আয়তন ছিল ৬,২৪৬ বর্গ মিটার। এর সাথে যোগ করা হয় ৬,০২৬ বর্গ মিটার আয়তন বিশিষ্ট এলাকা। এভাবে মূল মসজিদের সাথে আরও ১২,২৭০ বর্গ মিটার স্থান যুক্ত হয়। ফলে মসজিদের আয়তন বেড়ে দাঁড়ায় ১৬,৩২৬ বর্গ মিটার।

১৯৫২ সনের নভেম্বর মাস থেকে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। বাদশাহ সৌদের শাসনকালব্যাপী এ কাজ চলতে থাকে। বাদশাহ আবদুল আজীজের মৃত্যুর পরও তা অব্যাহত থাকে। এ সম্প্রসারণ কাজে ৫০ মিলিয়ন রিয়াল ব্যয় হয়। সৌদ বিন আবদুল আজীজ ১৩৭৫ হিজরীর (অক্টোবর ১৯৫৫ খৃঃ) ৫ই রবিউল আউয়াল সম্প্রসারিত ভবনের উদ্বোধন করেন।

ভবনের বর্ণনা

সৌদী বাদশাহ কর্তৃক সম্প্রসারিত ভবনটি আকারে খুবই বৃহৎ, দৈর্ঘে ১২৮ মিটার ও প্রস্থে ৯১ মিটার। এর সাথে ছাদ সম্বলিত মজিদি ভবনের উত্তর দিকে একটি বড় চত্বর যুক্ত আছে। এর ফ্লোর শীতল মার্বেল পাথর দ্বারা আচ্ছাদিত। এ চত্বরের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে তিনটি গ্যালারী রয়েছে। চত্বরের মধ্য অংশে আড়াআড়ি ভাবে একটি ব্লক রয়েছে যা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। সেখানেও আছে তিনটি গ্যালারী।

আরও ছোট ছোট তিনটি প্রবেশ পথ আছে। এ চত্বরের উত্তরাংশের ব্লকটি ৫টি গ্যালারী দ্বারা গঠিত। প্রত্যেকটি গ্যালারী ৬ মিটার প্রশস্ত। দক্ষিণের দেয়ালে আছে তিনটি দরজা।

সৌদী সম্প্রসারণকৃত পুরো ভবনটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– এর সবটাই কংক্রিটের ঢালাই। এতে রয়েছে ২৩২টি পিলার। মাটির নিচে এ পিলার গুলো সাড়ে সাত মিটার গভীরে প্রোথিত।

মসজিদে নববীতে ৫টি মিনার ছিল। তম্মধ্যে ৩টি মিনার ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে দু'টো নতুন মিনার নির্মিত হয়েছে। প্রত্যেকটি মিনার ৭২ মিটার উঁচু। বর্তমানে এই মসজিদের চার কোণে চারটি মিনারসহ মোট ১০টি মিনার রয়েছে।[৮৯]

বাদশাহ্ ফয়সল কর্তৃক নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্র

সৌদী ব্যবস্থাপনায় ভ্রমণের নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ফলে হাজী ও সাধারণ পর্যটকদের সংখ্যা বর্তমানে বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মসজিদে নববী তাই সব সময় পুণ্যার্থী ইবাদতকারীদের সমাগমে জমজমাট থাকে। সৌদী সম্প্রসারণ সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী পর্যটকের সংখ্যার তুলনায় বিস্তৃত জায়গাকেও অপরিসর মনে হয়। তাই বাদশাহ ফয়সল (রাহঃ) মসজিদের পশ্চিম প্রান্তে নামাযের স্থান সংকুলান করার আদেশ দান করেন। এ সমস্ত স্থাপনার স্বত্বাধিকারীদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। এ জন্য ব্যয় হয় ৫০ মিলিয়ন রিয়াল। অধিগ্রহণকৃত যায়গাটির পরিমাণ ৩৫,০০০ বর্গ মিটার।

এ সমস্ত আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ১৩৯৩ হিজরীতে (১৯৭৩ ঈসায়ী সাল)। সৌদী সরকার কর্তৃক দ্বিতীয়বার সম্প্রসারণ কাজ হাতে নেয়ার পর এগুলো অপসারণ করা হয়।

দ্বিতীয় দফা সম্প্রসারণ : (১৯৮৪-১৯৯৪ খৃঃ)

বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজীজ মসজিদে নববীর যে সম্প্রসারণ কাজ হাতে নেন তা এ যাবত কালের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ। এ সম্প্রসারণ কাজের বিশালতা সম্পর্কে ধারণা করা যাবে একটি মাত্র তথ্যের উল্লেখ করলে। প্রথম সৌদী সম্প্রসারণের ফলে মসজিদে নববীতে যত মুসল্লী একযোগে নামায পড়তে পারতো, দ্বিতীয় সম্প্রসারণের ফলে এর ধারণ ক্ষমতা বেড়ে যায় নয় গুণ। এর স্থাপত্য শৈলী ও অপূর্ব সুন্দর নান্দনিকতা যা হৃদয়কে অভিভূত ও মনকে বিমোহিত করে তা হচ্ছে বর্ণিত বিশালতার অতিরিক্ত। এ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য ছিল সর্বাধিক সংখ্যক ইবাদতকারী ও পর্যটকের স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করা; বিশেষত রমজান মাস ও হজ্ব মৌসুমে এবং মসজিদে অবস্থানরতদের জন্য সর্বাধিক আরাম ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা।
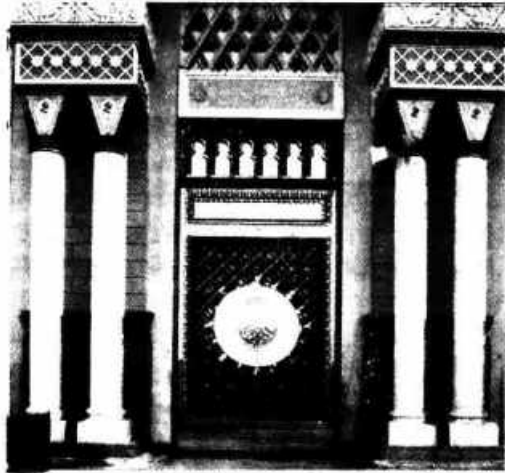
নবনির্মিত মসজিদে নববীর ৩৬টি দরজার একটি দরজা, যার প্রতিটির মাঝে স্বর্ণের চাকতীতে লেখা আছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)

এ প্রকল্প হাতে নেয়ার সময় পরবর্তী শতাব্দীর (চলতি একবিংশ শতাব্দীর) সম্ভাব্য প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে প্রকৃত সত্য এই যে, এ সম্প্রসারণ কাজ শুধু বাদশাহ্ ফাহাদের

সেবাও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজীজ নতুন সম্প্রসারণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন জুমাবার ৯ই সফর ১৪০৫ হিজরী। ইংরেজি ২ নভেম্বর ১৯৮৪ খৃঃ। ১৪০৬ হিজরীর মুহাররম মাসে এ বিশাল কর্মকাণ্ডের সূচনা হয় এবং ১৪১৪ হিজরীতে (১৯৯৪ ঈসায়ী সাল) তা শেষ হয়।

ভবনের বর্ণনা

দ্বিতীয় সম্প্রসারণকালে নির্মিত বিশাল ভবন প্রথম সম্প্রসারণের ভবনকে তিন দিক থেকে ঘিরে আছে। মসজিদের সম্মুখ ভাগে মজিদি ভবনের অনন্য সাধারণ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিকতাকে অটুট রাখার জন্য সংস্কারের বাইরে রাখা হয়েছে। গ্যালারী, পিলার এবং ছাদের নকশা ও প্যাটার্ণ প্রথম সম্প্রসারণ কালের নকশা ইত্যাদির সাথে হুবহু একই রাখা হয়েছে যাতে দুই ভবন একই চেহারায় রূপ নেয়। বাইরের দেয়ালগুলো গ্রানাইট পাথরে আবৃত করা হয়েছে এবং নতুন ভবনে ছয়টি নতুন মিনার স্থাপন করা হয়েছে। ভবনটির রয়েছে নিম্নভিত্তি (বেসমেন্ট) নিচতলা ও ছাদ। নিচতলাটি ভবনের মূল অংশ, এর আয়তন ৮২,০০০ বর্গ মিটার এবং এর ফ্লোর মার্বেল পাথরে আবৃত। এর উচ্চতা ১,২৫৫ মিটার এবং এতে পিলার রয়েছে ২,১০৪টি। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনায় প্রায় প্রতিটি পিলারের নিম্নাংশ দিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বায়ু প্রবাহের ব্যবস্থা রয়েছে। এক পিলার থেকে আরেক পিলারের দূরত্ব ৬ মিটার। অতএব চার পিলারের মধ্যবর্তী খোলা জায়গার আয়তন ৬×৬=৩৬ মিটার। আর যেখানে গম্বুজ স্থাপন করা হয়েছে সেখানকার পিলার গুলোর দূরত্ব ১৮ মিটার। এর ফলে গম্বুজের নিচে উন্মুক্ত চত্বর হচ্ছে ১৮×১৮=৩২৪ মিটার। নতুন ভবনে এ রকম চত্বর বা প্লাজা রয়েছে ২৭টি। এগুলোর ওপরে রয়েছে ভ্রাম্যমান গম্বুজ। পুরো চত্বরটি স্বাভাবিক আলো বাতাসের জন্য অনুকূল আবহাওয়ার প্রয়োজনে গম্বুজগুলো উন্মুক্ত করা যায়।[৯০]

মসজিদে নববীর অপূর্ব সুন্দর কারুকার্যময় ভেতরের একটি অংশ

প্রত্যেক গম্বুজের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ৭.৩৫ মিঃ এবং একটি গম্বুজের ওজন হচ্ছে ৮০ টন। গম্বুজের অভ্যন্তর ভাগ টেকসই কাঠের ওপর হাতে খোদাই করা নান্দনিক নকশায় সজ্জিত এবং নির্ধারিত অংশ বিশুদ্ধ স্বর্ণের সুচারু পাতে ঢাকা। গম্বুজের বাইরের তল গ্রানাইটের ক্যানভাসে সিরামিকে আবৃত। গম্বুজ গুলো পরিচালিত হয় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে। ছাদের উপরের অংশ নামায আদায়ের উপযুক্ত করে তৈরি। মুসল্লীদের ছাদে ওঠার জন্য রয়েছে সুপ্রশস্ত অসংখ্য সিঁড়ি আর বিদ্যুৎ চালিত অর্ধডজন এস্কেলেটর। এর পূর্ণ আয়তন ৭৬,০০০ বর্গ মিটার তম্মধ্যে ৫৮,২৫০ বর্গ মিটার জায়গায় নামায আদায় করা যায়। ছাদের যে অংশে সূর্যের কিরণ পড়ে সে অংশ গ্রীক মার্বেল পাথরে আবৃত। এই ছাদে ৯০,০০০ মুসল্লী এক সঙ্গে নামায আদায় করতে পারে। ছাদের উপরের একাংশে আচ্ছাদিত গ্যালারী আছে যার আয়তন ১১,০০০ বর্গ মিটার ও উচ্চতা ৫ মিটার। যদি প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে এ ছাদের ওপর যাতে দ্বিতীয় ছাদ দেয়া যায় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ওসমানীয়া খলীফাদের তৈরি মসজিদে নববীর মূল ভবন অর্থাৎ রিয়াজুল জান্নাতের সামনে দু'অংশে

বিভক্ত দু'টি খোলা চত্বরে ৬×২=১২টি স্বয়ংক্রিয় শ্বেতশুভ্র সোনালী কারুকার্যময় ছাতা স্থাপন করা হয়েছে। রোদের সময় তা মেলে দেয়া হয় আর ছায়ার সময় বন্ধ রাখা হয়। ছাতাগুলো খোলা ও বন্ধ করার কাজ পরিচালিত হয় স্বয়ংক্রিয় ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে।

মসজিদে নববীর মূল ভবনের সামনের চত্বরে প্রতিষ্ঠিত ছাতা

মসজিদের খোলা চত্বর

মসজিদের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিক খোলা চত্বর দিয়ে ঘেরা। এর আয়তন ২,৩৫,০০০ বর্গ মিটার। এর কিছু অংশ সাদা শীতল পাথরে মোড়ানো যাতে সূর্যের তাপে তা তেতে না উঠতে পারে। বাকী অংশ গ্রানাইট পাথর দিয়ে ঢাকা। এগুলো বিশেষভাবে তৈরি বাতি দিয়ে সজ্জিত। ১৫১ টি গ্রানাইট ও সিনথেটিক পাথর মোড়ানো পিলারে এ বাতিগুলো লাগানো। পুরো এলাকাটি কারুকার্যময় ইস্পাতের রেলিং দিয়ে ঘেরা। এখানে ৪,৩০,০০০ মুসল্লী একত্রে নামায পড়তে পারে। এ চত্বর দিয়ে মহিলা ও পুরুষদের পৃথক পৃথক টয়লেট, অজুখানা ও বিশ্রামাগারে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ভূগর্ভে দু'স্তর বিশিষ্ট কার পার্কের সাথেও এটি সংযুক্ত।
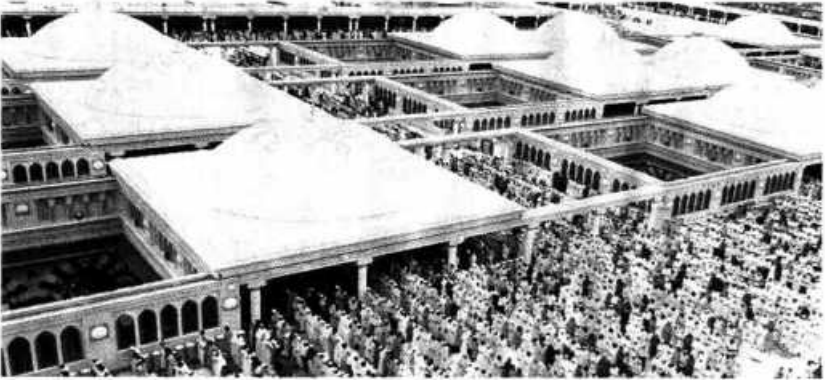
মসজিদে নববীর ছাদে মুসল্লিরা নামায পড়ছেন। ছাদে উঠার জন্য রয়েছে অসংখ্য সিঁড়ি ও আধা ডজন অত্যাধুনিক এস্কেলেটর

ইতিহাসে নজির বিহীনঃ

মসজিদে নববীতে [illegible] ১ লক্ষ মুসল্লী একসাথে নামাজ পড়ে

সমজিদে নববীর দ্বিতীয় সৌদী সম্প্রসারণ বিশালতার দিক থেকে সর্ববৃহৎ। আমাদের জন্য এ কথা জানাই যথেষ্ট যে, প্রথম সৌদী সম্প্রসারণের তুলনায় দ্বিতীয় সম্প্রসারণে মসজিদের ধারণ ক্ষমতা ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম সৌদী সম্প্রসারণের পর মসজিদের ধারণ ক্ষমতা যেখানে ছিল ২৯,৭৭৮ দ্বিতীয় সম্প্রসারণের পর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৬৮,০০২ -এ। এছাড়া ৯০,০০০ মুসল্লী ধরে ছাদের ওপর। যদি খোলা চত্বরের ধারণ ক্ষমতা ৪,৩০,০০০ মুসল্লী এর সাথে যোগ করা হয় তাহলে মসজিদ ও খোলা চত্বর মিলে মোট ধারণ ক্ষমতা দাঁড়ায় ৭,৮৮,০০২ -এ। এ বর্ধিত সংখ্যা অব্যাহত গতিতে ক্রমবর্ধমান, হ্রাসের কোন সম্ভাবনা নেই। সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহাম্‌দিহী সুবহানাল্লাহিল আজীম।

মসজিদের ভেতরের মিম্বর ও মেহরাব

মসজিদে নববীর মেহরাব, যেখানে দাঁড়িয়ে রাসূলে পাক (সাঃ) নামায পড়তেন

মসজিদে নববীর ছাদ ছিল খেজুর গাছের কাণ্ড দিয়ে তৈরি এবং পিলার রূপেও ব্যবহৃত হয়েছিল খেজুর গাছ। একটি খেজুর গাছের খুঁটিতে হেলান দিয়ে হুজুরে আকরাম (সাঃ) সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতেন। বক্তব্যের গুরুত্ব ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) কে অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতে হত। একদিন একজন আনসার মহিলা বলল ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার জন্য ঝাউগাছের তিন তাক বিশিষ্ট একটি মিম্বর তৈরি করতে পারিনা?" রাসূলুল্লাহ সম্মতি দিলেন। পরবর্তী জুমাবারে যখন হুজুরে আকরাম (সাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন তখন পূর্বের খেজুরের খুঁটিটি কাঁদতে আরম্ভ করল। সহিহ বুখারীতে হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) এর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ "জুমাবারে নবী করীম (সাঃ) একটি খেজুর গাছের খুঁটিতে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। আনসারদের একজন পুরুষ অথবা নারী বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার জন্য একটি মিম্বর বানাতে পারিনা?" "তিনি বললেন, "হাঁ, যদি তোমরা ইচ্ছা কর।" অতএব তারা একটি মিম্বর তৈরি করল। পরবর্তী জুমাবারে তিনি মিম্বরে আরোহণ করলে দেখা গেল ইতোপূর্বেকার খেজুর গাছের খুঁটিটি এমনভাবে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে যেভাবে একজন বাচ্চা ছেলে কাঁদে। এতে নবী করীম (সাঃ) মিম্বর থেকে নেমে এলেন, খেজুর গাছের খুঁটিটিকে জড়িয়ে ধরলেন। ফলে খুঁটিটি শিশুদের মত গোঙাতে থাকল এবং ধীরে ধীরে একসময় শান্ত হয়ে এল। তিনি বললেন ঃ সে একান্তে আল্লাহ্‌র জিকির শুনত, তাই সে কাঁদছিল। [১১]

ইবনে খুজাইমা হযরত আনাস (রাঃ) হতে এক হাদিসে বর্ণনা করেন ঃ "গাছটি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে কাঁদছিল।" তাঁরই বরাত দিয়ে আদ দারিমি বর্ণনা করেন ঃ "খুঁটিটি ষাঁড়ের বিলাপের মত বিলাপ করছিল।" উবাই বিন কা'বের বরাত দিয়ে আহমদ, আদ দারিমি ও ইবনে মাজাহ বলেন ঃ যখনই তিনি এর পাশ দিয়ে যেতেন তখন এটি কাঁদত যতক্ষণ না একে কেটে টুকরো করা হল।[১২]

মসজিদে নববীর মিম্বর, যেখানে দাঁড়িয়ে রাসূলে পাক (সাঃ) খুতবা প্রদান করতেন

এ হাদিসটি অতি সুপরিচিত ও বহুল প্রচলিত হাদিসের অন্যতম। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এর বিবরণ এসেছে। হাদিসের বিশেষজ্ঞগণ যেমন এর বর্ণনা করেছেন, ১০ জনের অধিক সাহাবীও এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১৩]

মিম্বরের ইতিহাস

হিজরী অষ্টম সালে প্রথম মিম্বরটি তৈরি হয়। এর ধাপ ছিল তিনটি। নবী করীম (সাঃ) এর ওপর বসতেন এবং দ্বিতীয় ধাপে পা মোবারক রাখতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খলীফা হবার পর দ্বিতীয় ধাপে বসতেন এবং তৃতীয় ধাপে পা রাখতেন। নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি সম্মান বশত তিনি এরূপ করতেন। এরপর হযরত উমর (রাঃ) খলিফা হওয়ার পর তিনি তৃতীয় ধাপে বসতেন এবং মাটিতে পা রাখতেন। হযরত উসমান (রাঃ)ও ছয় বছর একই অভ্যাস বজায় রাখেন। এরপর তিনি নবী করীম (সাঃ) যে ধাপে

বসতেন সেখানে বসে খুতবা দিতে থাকেন। এরপর হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হজ্ব করতে এলে তিনি মিম্বরের ধাপ বর্ধিত করেন এবং শেষ পর্যন্ত মিম্বরটি নয় ধাপ বিশিষ্ট হয়। সাহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ) এর অভ্যাস ছিল ৭ম ধাপে বসা যা ছিল রাসূল (সাঃ) এর মিম্বরের প্রথম ধাপ। ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খৃষ্টাব্দ) অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া পর্যন্ত মিম্বরটি সেভাবেই ছিল। ইয়েমেনের বাদশাহ্ আল মোজাফ্ফর নতুন মিম্বর তৈরি করেন। এরপর বারকয়েক মিম্বরটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তম্মধ্যে একটি হচ্ছে ৯৯৮ হিজরীতে উসমানীয় শাসক সুলতান মুরাদ-৩য় কর্তৃক প্রদত্ত উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত। এটি খুবই দৃষ্টি নন্দন ও সুচারু ভাবে নির্মিত। এ মিম্বরটি এখনো বিদ্যমান।[৯৪]

মিম্বর সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) এর বাণী

নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র হাদিস থেকে এ মিম্বরের সুউচ্চ মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের টুকরোর (রিয়াজুল জান্নাহ্) মধ্যে একটি টুকরো এবং আমার মিম্বরটি আমার হাউজের ওপরে স্থাপিত।[৯৫]

তাঁর মহান বাণী, "এটি জান্নাতের টুকরোর মধ্য থেকে একটি টুকরো"-র অর্থ হচ্ছে এ স্থানে আল্লাহর জিকির (স্মরণ) করা হলে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ ঘটে। এর অর্থ এও হতে পারে যে, এখানে ইবাদত করলে তা মানুষকে জান্নাতের দিকে পৌঁছে দেয়। অথবা আক্ষরিক অর্থে এটি জান্নাতের বাগানের মধ্য থেকে একটি বাগান এবং পুনরুত্থান দিবসে (কিয়ামতের দিন) একেই বেহেশতের অংশে পরিণত করে দেয়া হবে।

এ সবই হচ্ছে হাদিস বিশারদদের প্রদত্ত ব্যাখ্যার সারসংক্ষেপ।[৯৬]

এ মিম্বরের উচ্চ মর্যাদার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে যে, কেউ যদি এখানে মিথ্যা শপথ করে তার জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। কারণ রাসূলাল্লাহ (সাঃ) এখানে শপথ করার অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু এ মর্যাদাপূর্ণ স্থানে কেউ মিথ্যা শপথ করলে তার জন্য কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারীও দিয়েছেন। সুনানে আবু দাউদে হযরত যাবির (রাঃ) বর্ণিত এক মারফু'[৯৭] হাদিসে বলা হয়েছে ঃ যে কেউ এখানে মিথ্যা শপথ করে, হোক তা একটি সবুজ মিছওয়াক এর জন্যও, সে দোযখে তার জন্য স্থান করে নেবে (অথবা তিনি বলেন) সে অবশ্যই দোযখে যাবে।"[৯৮] (ইবনে খুজাইমিয়াহ, ইবনে হিব্বান এবং আল-হাকিমও এ হাদিস বর্ণনা করেছেন যাঁরা বিশ্বস্ত বলে স্বীকৃত)

আন নাসাঈ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসূত্রে আবু উমামা বিন জালাবাহ'র রেওয়ায়েতে এক মারফু' হাদিসে বলেন ঃ "কেউ কোন মুসলমানের সম্পত্তি আত্মসাতের উদ্দেশ্যে যদি আমার মিম্বরের সন্নিকটে মিথ্যা শপথ করে তার ওপর আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাকুল ও সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ। রোজ হাশরে আল্লাহ্ তার ফরয– নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।"

নবী করীম (সাঃ) এর মেহরাব

মদীনা শরীফে হিজরত করার পর কিছু দিন পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ) বায়তুল মুকাদ্দিসের[৯৯] দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। এরপর পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

"অতএব এখন থেকে মসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন (সালাতের সময়) সে দিকেই মুখ ফিরাবে। অবশ্য

মসজিদে নববীর মেহরাব, যেখানে রাসূলে পাক (সাঃ) নামায পড়েছেন, সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছেন ও বিচার কার্য পরিচালনা করেছেন এবং সসৈন্যে যেখান থেকে জিহাদে গমন করেছেন

কিতাবীরা (আহলে কিতাব) জানেনা যে এটি তোমার প্রতিপালকের তরফ হতে নাযিলকৃত সত্য এবং আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনবহিত নন।" (সূরা বাকারা ২ ঃ ১৪৪)

অহীর নির্দেশ অনুসারে তিনি কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়তে থাকেন। প্রথম ১০ দিন কিংবা তার বেশি তিনি হযরত আয়িশার (রাঃ) খুঁটিকে[১০০] সামনে রেখে নামায পড়েন। অতপর তিনি আরও সামনে অগ্রসর হয়ে নামায আদায় করেন। তাঁর কিংবা খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মসজিদে কোন মেহরাব ছিলনা। সর্বপ্রথম ৯১ হিজরীতে হযরত উমর বিন আবদুল আযিয (রাহঃ) মসজিদে মেহরাব সংযোজন করেন যা 'নবীর মেহরাব' রূপে পরিচিত। কারণ যে যায়গায় এটি স্থাপিত হয়েছিল সেখানেই একটি খেজুর গাছের খুঁটিকে সামনে রেখে নবীজী (সাঃ) নামায পড়তেন। এ মেহরাবের কাছেই একটি খুঁটি রয়েছে যাতে লিখা ঃ **আল উসতুয়ানাহ আল মুখাল্লাকাহ্**। তাই কেউ যদি মেহরাবের পাশে দাঁড়ায় তাহলে সেই নামাযের পবিত্র স্থানটি তার ডান পাশে থাকবে। মেহরাবটি এমনভাবে স্থাপিত যে কেউ যদি এখানে নামায পড়তে চায় তাহলে তার কপাল যে স্থানটিকেই স্পর্শ করবে সেখানে নামাযের সময় হুজুর (সাঃ) এর নূরানী কদম মোবারক স্থাপিত থাকত।[১০১] যে খুঁটির পেছনে নবী করীম (সাঃ) নামায পড়তেন তা নির্দেশ করতে গিয়ে ইবনে আবু আয-যিনাদ বলেন ঃ খুঁটিটি ছিল আল উসতুয়ানাহ আল মুখাল্লাকাহ্য় যা নবীর মেহরাবের ডান পাশে পড়ে।"[১০২] মেহরাবের বর্তমান স্থানটি ৮৮৮ হিজরী সালে সুলতান কুয়েতবের আমল থেকে চিহ্নিত। মেহরাবটি ১৪০৪ হিজরীতে (১৯৮৪ইং) সৌদী বাদশাহ ফাহাদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ রূপে প্রতিস্থাপিত হয়।

মসজিদে নববীতে ইবাদতের ফজিলত

মসজিদে নববীর অতি উচ্চ মর্যাদা, অনন্য বৈশিষ্ট্য ও অসংখ্য ফজিলত রয়েছে। মহান আল্লাহ্র বাণীতে ও হাদিসের ঘোষণায় এর উচ্চ মর্যাদা, অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বেশুমার ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে ঃ মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "...... যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর সেটিই তোমার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য। সেখানে এমন সব লোক আছে যারা পবিত্রতা হাসিলে অনুরাগী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন।" (আত্ তওবা ৯ ঃ১০৮)

আস সামহুদি বলেন ঃ উক্ত ঘোষণা মসজিদে নববী ও মসজিদে কু'বা উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। এ দু'টি মসজিদই তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন থেকেই। এটি সকলের নিকটই সুবিদিত এবং এ আয়াতে উভয় মসজিদকেই উপলক্ষ করা হয়েছে।[১০৩]

এ মসজিদের ফজিলতের মধ্যে আরও রয়েছে যে, এ মসজিদে একটি বারের ইবাদত, এক হাজার ইবাদতের সমান। অতএব এ মসজিদে একবার ইবাদত অন্য মসজিদের ছয় মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। (ব্যতিক্রম শুধু কাবা শরীফের মসজিদ)।

হযরত আবদল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "আমার মসজিদের নামায মক্কার পবিত্র মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদের ইবাদতের চাইতে হাজার গুণ শ্রেয়।"[১০৪]

অন্যত্র হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ মক্কা শরীফে নামায আদায়ের সওয়াব প্রতি রাকাতে ১ লক্ষ আর মদীনা শরীফে ৫০ হাজার। −ইবনে মাজাহ্।

আল বাজ্জার এবং আত-তাবারানী আবুদ্দারদা থেকে একটি মারফু' হাদিস বর্ণনা করেন ঃ পবিত্র মক্কার মসজিদে এক রাকাত নামায এক লক্ষ রাকাতের সমান, আমার মসজিদে এক হাজার রাকাতের সমান ও বায়তুল মোকাদ্দিসে তা পাঁচশ রাকাতের সমান।"[১০৫]

হযরত আল আরকাম (রাঃ) এর বর্ণনায় এসেছে যে তিনি একবার বায়তুল মোকাদ্দিস গমনের ইরাদা (ইচ্ছা পোষণ) করেন। ভ্রমণের প্রস্তুতি শেষ হলে তিনি হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) হতে বিদায় নেয়ার জন্য যান। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি কোথা যেতে মনস্থ করেছ?" তিনি জবাব দিলেন ঃ "আমি বায়তুল মোকাদ্দিস যেতে ইচ্ছা করছি।" নবী করীম (সাঃ) জানতে চাইলেন ঃ

"কেন?" তিনি বললেন ঃ "ইবাদত করার জন্য।" রাসূলে পাক (সাঃ) বললেন ঃ "এখানকার ইবাদত সেখানকার ইবাদত হতে হাজার গুণ শ্রেয়।" আত-তাবারানী বলেন ঃ "সেখানকার ইবাদতের চেয়ে এখানকার ইবাদত হাজার গুণ শ্রেয়।"

মসজিদে নববীতে সালাত আদায়ের ফজিলত সম্পর্কে ইমাম আহমদ ও তাবারানী আরও একটি বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সে সূত্রে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে মকবুল (সাঃ) বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে একটানা ৪০ ওয়াক্ত নামায (কোনরূপ বিরতি ছাড়া) জামায়াতের সাথে আদায় করবে, তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি, আযাব থেকে মুক্তি এবং নিফাক (শিরক) থেকে মুক্তি লেখা হবে।

ইমাম বায়হাকী (রাহঃ) নবীয়ে রহমত (সাঃ) এর অন্য একটি হাদিসের সার-নির্যাস বর্ণনা করেন এভাবে ঃ যে ব্যক্তি আমার মসজিদে নামায পড়ার জন্য পাক-পবিত্র হয়ে নিজগৃহ থেকে বের হয়ে আসবে, তার আমলনামায় পূর্ণ এক হজ্বের সাওয়াব লেখা হবে।

সম্প্রসারিত অংশে ইবাদত

মসজিদে নববীতে ইবাদতের বহুগুণ বর্ধিত সওয়াবের ঘোষণা এর সম্প্রসারিত অংশে সম্পাদিত ইবাদতের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। সলফে সালেহীন (রাঃ) এ বিষয়ে একমত। পরবর্তী যুগের ধর্মবেত্তারাও অভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

আল-মুহিব আত তাবারি বলেন ঃ সওয়াব বর্ধিতকরণ সংক্রান্ত হাদিস রাসূলে করীম (সাঃ) এর সময়ে বিদ্যমান মসজিদের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য ছিল পরবর্তীতে সংযোজিত অংশের জন্যও তা সমভাবে প্রযোজ্য। সাহাবীগণের (রাঃ) ব্যাখ্যামূলক বর্ণনায় এর সমর্থন রয়েছে।[১০৬]

মসজিদে নববীর ভেতরে ও বাইরে লক্ষ লক্ষ মুসল্লি এশার নামায পড়ার জন্য অপেক্ষারত

শাইখুল ইসলাম ইমাম আল তাইমিয়া - আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন - বলেন, "তাঁর (আল্লাহর নবী সাঃ এর) মসজিদ বর্তমান মসজিদ থেকে ছোট ছিল যেভাবে পবিত্র কা'বার মসজিদও ছোট ছিল। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনসহ তাঁদের পরবর্তী সময়কার দায়িত্বশীলগণ দু'টো মসজিদেরই সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। সর্বাবস্থায় সম্প্রসারিত অংশের ক্ষেত্রে সেই একই বিধিমালা প্রযোজ্য যা প্রাথমিক যুগের সংযোজিত অংশের জন্য প্রযোজ্য ছিল।[১০৭]

খোলা চত্বরে নামায আদায়

যখন নামাযীর সংখ্যা বেড়ে যায় তখন কাতার লম্বা হয়ে বর্ধিত খোলা অংশেও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এমনকি তা রাস্তা পর্যন্তও পৌছে যায়। ফলে একজন নামাযী সে পরিমাণ বর্ধিত সওয়াবের হকদার যা মসজিদের অভ্যন্তরে নামায আদায়কারীর প্রাপ্য। কারণ কাতারগুলো পরস্পর সন্নিবদ্ধ। তাফসীরে আদওয়া আল বয়ানের সংকলক বলেন ঃ বর্ধিত সওয়াব আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত রহমত ও দয়া যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য অবারিত করে দিয়েছেন, প্রত্যেক মুমিনই আল্লাহ্‌র এ অফুরন্ত নেয়ামত প্রাপ্ত হয়। ফলে একজন ভেতরে দাঁড়ালো কী বাইরে দাঁড়ালো এজন্য দু'জন বান্দার মধ্যে কোন তারতম্য ঘটতে পারে না। এমন নয় যে, তিনি একজনকে (বাইরের) সাধারণ সওয়াবই দেবেন যেখানে তাঁদের কাঁধ পরস্পরের সাথে মিশে আছে।[১০৮]

মসজিদে নববী পরিভ্রমণের সাধারণ আদব

প্রত্যেক মসজিদেই প্রবেশের কিছু সাধারণ আদব-কায়দা নিয়ম-কানুন আছে। আল্লাহ্‌র নবীর মসজিদ পরিভ্রমণের সময়ও পালনীয় কিছু আদব ও নিয়ম-কানুন রয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত সে সব আদব-কায়দা ভক্তি সহকারে পালন করা।

১। দেহ মনে শুচি-শুভ্র (পাক-পবিত্র) হয়ে, সুন্দর পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে এবং খুশবু লাগিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করা উচিত।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ "হে আদম সন্তানেরা! (পাক-পবিত্র) সুন্দর পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে ইবাদতে মশগুল হও ...." (সূরা আল আ'রাফ ৭ ঃ ৩১)

২। শরীরে ও পোষাকে যাতে কোন নাপাকী না লাগে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে পিঁয়াজ রসুন ভক্ষণ করে তার উচিত আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকা ও নিজের গৃহে অবস্থান করা।"[১০৯]

৩। মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা ব্যবহার করা ও নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা "বিস্‌মিল্লাহি ওয়াস্‌সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাফ তাহ্‌লি আবওয়াবা রাহমাতিকা" অর্থাৎ– আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র রাসূলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আল্লাহ্ আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

৪। নামাযে কিরাত পড়ার সময়, সালাম দেওয়ার সময় কিংবা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার সময় উচ্চ কণ্ঠ না হওয়া।

৫। রিয়াজুল জান্নাতে (বেহেশ্‌তের টুকরায়) দু'রাকাত নফল নামায পড়া। সেখানে ভিড় হলে বা যায়গা না পাওয়া গেলে মসজিদের অন্যত্রও এ নামায পড়া যায়।

৬। নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফকে কিবলা করে নামায না পড়া। কারণ নামায সব সময় ক্বাবা শরীফের দিকে কিবলামুখী হয়েই পড়তে হয়। রওজা মুবারক তাওয়াফ না করা; কেননা তাওয়াফ শুধু কাবা শরীফকে কেন্দ্র করেই হয়।

মদীনা শরীফ গমনের নিয়তে যাত্রা করা

গুরুত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কারণে মদীনার মসজিদ, কাবাগৃহ ও বায়তুল মোকাদ্দিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা যায়।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্যত্র যাওয়ার জন্য সওয়ারী পশুকে লাগাম পরিওনা ঃ মসজিদ তিনটি হচ্ছে ঃ মসজিদুল হারাম (মক্কা শরীফ), মসজিদে নববী (মদীনা শরীফ) ও বায়তুল মুকাদ্দিস (মসজিদুল আক্‌সা)।[১১০]

মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার পর থেকে সেখানে পৌছা পর্যন্ত একজন মুসলমানের সওয়াব অর্জন চলতে থাকে এবং সেখানে পৌছার পরও তা অব্যাহত থাকে। ইবনে হিব্বানের 'সহিহ' গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে ঃ রাসূলে করীম

এখনও মরু বদুঈন কাফেলা ছুটে চলে নবীজীর রওজাপাক জিয়ারতে, 'হৃদয়ের টানে মদীনার পানে'

(সাঃ) বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্য হতে কেউ যখন মসজিদের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে তার একটি পদক্ষেপে একটি করে সওয়াব হয় এবং আরেকটি পদক্ষেপে একটি করে গোনাহ মাফ হয়ে যায়। ১১১

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন ঃ "যে কেউ ভাল কোন কিছু শিখার বা শিক্ষা দানের নিয়তে আমার মসজিদে আসে তার মর্যাদা একজন মুজাহিদের সমান। ১১২

আর এ ছাড়া যে অন্য নিয়তে আসে তার অবস্থা সেই লোকের মত যে অন্যের সম্পদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ১১৩

আবু উমামা আল বাহিলি (রাঃ) বলেন ঃ তিনি বলেছেন ঃ যে সকাল বেলা মসজিদে আসে শুধু মাত্র এ উদ্দেশ্যে যে, সে ভাল কিছু শিখবে অথবা শিক্ষা দেবে তার পুরস্কার একজন হজ্ব যাত্রীর সমান যে হজ্ব সম্পন্ন করেছে। ১১৪

নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফ

হযরত রাসূলে মকবুল (সাঃ) যখন ইন্তেকাল ফরমান তখন তাঁর দাফনের বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। তাঁর সম্মানিত সাহাবাগণ কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছিলেন না। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেন ঃ তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন ঃ "একজন নবীকে তাঁর ওফাতস্থল ছাড়া অন্যত্র দাফন করা উচিত নয়।"

এতে সবাই তাঁর মাদুর সরিয়ে সেখানেই কবর প্রস্তুত করলেন।

এভাবে হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) কে হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর সেই মর্যাদাপূর্ণ কক্ষেই দাফন করা হয়। সেই মহান কক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে সাইয়েদুল মুরসালীন সমাহিত হন এবং উত্তর কোণে মা আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) বসবাস করতে থাকেন। পবিত্র কবরগাহ এবং তাঁর অবস্থান স্থলের মাঝখানে একখানা পর্দা ছিল। এরপর যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ইনতিকাল ফরমান তখন মা আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) তাঁকে হুজুরে আকরাম (সাঃ) এর পবিত্র কবরগাহের পাশে সমাহিত করার অনুমতি প্রদান করেন।

রাসূলে পাক (সাঃ) এর পবিত্র রওজা মুবারক

আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

ফলে হুজুরে আকরাম (সাঃ) এর কবরগাহ থেকে এক হাত পেছনে কবর তৈরি করা হয় এবং এমন ভাবে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) কে শায়িত করা হয় যাতে তাঁর মাথা হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) এর কাঁধ মুবারকের বিপরীত দিকে থাকে। এ দুই মহান কবরগাহ ও আপন বাসস্থানের মাঝখানে হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) কোন পর্দা স্থাপন করেননি। তিনি বলতেন ঃ "তাঁদের একজন আমার স্বামী অন্যজন আমার পিতা।"

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর ইনতেকালের পর তাঁর দুই সাথীর পাশে তাঁকে দাফন করার জন্য হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) অনুমতি প্রদান করেন। ফলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর কবরগাহ হতে এক হাত পেছনে হযরত উমর (রাঃ) এর জন্য কবর তৈরি করা হয় ও তাতে তাঁকে এমনভাবে দাফন করা হয় যাতে তাঁর মাথা হযরত সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) কাঁধ মুবারকের বিপরীত দিকে হয়। হযরত উমর (রাঃ) যেহেতু লম্বা ছিলেন তাই তার পদযুগল কক্ষটির পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত পৌছে যায়। এরপর হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) পবিত্র কবরসমূহ ও তাঁর গৃহের মাঝামাঝি একটি পর্দা লাগিয়ে দেন। কারণ হযরত উমর (রাঃ) তাঁর জন্য মাহরম ছিলেন না।[১১৫]

এভাবেই হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবীগণ হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর ইনতেকালের পরও তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন।

হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) এর রওজা পাক জিয়ারত

নবী প্রেমিক মুসলমান নর-নারীর জন্য হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) এর রওজা পাক জিয়ারত তুলনাবিহীন সৌভাগ্যের বিষয়। যাঁরা এখানে উপস্থিত হন বা কাছাকাছি পৌছেন তাঁরা অসীম আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে রওজাপাকের জিয়ারতে হাজির হন। মহান আল্লাহ তা'লার পিয়ারা হাবিবের শেষ বিশ্রামস্থলের দিকে অভিযাত্রা সুন্নতেরই দাবী। সহিহাইন -এ বলা হয়েছে ঃ

"তিনটি মসজিদ ভিন্ন অন্য কোথাও জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য সওয়ারী পশুকে সজ্জিত করোনা ঃ (সে তিনটি মসজিদ হচ্ছে) ঃ আমার মসজিদ (মদীনা শরীফ), পবিত্র কাবার মসজিদ (ক্বাবা শরীফ) এবং আল আকসা (বায়তুল মুকাদ্দিস) মসজিদ।"[১১৬]

যে কেউ এখানে জিয়ারতে আসেন অতি আদব ও ভক্তি সহকারে এবং অনুচ্চস্বরে আল্লাহ্‌র হাবীবের প্রতি তাঁদের সালাত ও সালাম পেশ করা উচিত।

আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

অর্থাৎ- "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ওপর আল্লাহর তরফ হতে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।"

কেউ যদি নিম্নোক্ত ভাবে সম্বোধন করে রওজায়ে রাসূলে পাক (সঃ) জিয়ারত করে তবে তাও শুদ্ধ; কারণ এ সবই হুজুরে আকরাম (সাঃ) এর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা পেশ করার অন্তর্গত। যেমন ঃ

আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ! আস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ্! আস্সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া খায়রা খাল্কিল্লাহ্। আস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলাইকা ইয়া সায়্যিদাল মুরসালীন! আস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলাইকা ইয়াখাতামান্নাবিয়্যীন! আস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামীন! আস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলাইকা ইয়া শাফী'আল মুযনেবীন। সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইকা দায়িমীনা মুতালাযিমীনা ইলা ইয়াওমিদ্দীন! আশ্হাদু আন্নাকা ইয়া রাসূলাল্লাহি কাদ্ বাল্লাগতার্ রিসালাতা ওয়া আদ্দাইতাল্ আমানাতা ওয়া নাসাহ্তাল উম্মাতা ওয়া কাশাফতাল গুম্মাতা ফাজাযাকাল্লাহু আন্না আফদালা মা জাযা নাবিয়্যান আন উম্মাতিহী! আল্লাহুম্মা আতিহিল-ওয়াসীলাতা ওয়াল্ ফাদীলাতা ওয়াদ্ দারাজাতার্ রাফি'আতা ওয়াব্আসহু মাকামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া'আদ'তাহু ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ।

রিয়াজুল জান্নাত বা বেহেশ্তের টুকরো [মহানবী (সাঃ) মসজিদে নববীর এ অংশে নামায পড়াকে অতি উত্তম ইবাদত বলে উল্লেখ করেছেন]

অর্থাৎ- "হে নবী! অপনার প্রতি অজস্র ধারায় শান্তি এবং আল্লাহ্র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম। হে আল্লাহ্র হাবীব! আপনার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম। হে আল্লাহ্র সর্বোত্তম সৃষ্টি! আপনার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম। হে রাসূলগণের সর্দার! আপনার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম। হে শেষ নবী! আপনার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম। হে রাহ্মাতুললিল আলামীন! আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম।

হে গুনাহ্গারদের জন্য সুপারিশকারী! আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম। কিয়ামত পর্যন্ত আপনার প্রতি অবিরাম ও নিয়মিত অনেক অনেক দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি (আল্লাহ্র) বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন (তাঁর বান্দাগণের কাছে)। (অর্পিত) আমানত আদায় করেছেন এবং উম্মাতের (সার্বিক) কল্যাণের বিহিত করেছেন; অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পক্ষ হতে আপনাকে এমন উত্তম প্রতিদান দিন, যা কোন নবীর উম্মাতের পক্ষ হতে কোন নবীর প্রতি প্রদত্ত হতে পারে। হে আল্লাহ্! তুমি তাঁকে মর্যাদা ও অতি উচ্চ সম্মান দাও এবং যে মাকামে মাহমুদের ওয়াদা তুমি তাঁকে দিয়েছ, সেখানে তাঁকে উন্নীত কর। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা খিলাফ কর না।

ইসলামী শরীয়তে যেভাবে আছে সেভাবে তাঁর জন্য রহমত ও কল্যাণ কামনা করা আমাদের উচিত। মহান আল্লাহ তা'লার এ অতুলনীয় বাণীর হক আদায়ে সচেষ্ট হওয়াও আমাদের একান্ত কর্তব্য; যাতে তিনি বলেছেন ঃ

"আল্লাহ নবীর প্রতি দরূদ (সালাম) পেশ করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণও নবীর জন্য দরূদ (সালাম) পাঠ করে। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" (সূরা আহযাব ৩৩ : ৩৬)

তারপর যথাক্রমে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) এর প্রতি যথাযথ সালাম প্রদান করা ও তাঁদের জন্য আল্লাহ্র রহমত ও সন্তুষ্টি কামনা করা আমাদের কর্তব্য। বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) নিম্নোক্ত কায়দায় সালাম জানাতেন ঃ

আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)

আস্সালামু আলাইকা ইয়া আবু বকর (রাঃ)

আস্সালামু আলাইকা ইয়া আবাতাহ্ (উমর রাঃ)

অর্থাৎ ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ আপনার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন।

ইয়া আবু বকর (রাঃ) আল্লাহ আপনার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন।

ইয়া আব্বাজান (উমর রাঃ) আল্লাহ আপনার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন।

রাসূলে করীম (সঃ) এর রওজা মুবারক জিয়ারতের পরপরই একই সাথে অথবা পৃথকভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা যায় ঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর মাজার জিয়ারতের দোয়া ঃ

আস্সালামু আলাইকা ইয়া খালীফাতার্ রাসূলিল্লাহি ওয়া সা'নিয়াহু ফিল গারি ওয়া রাফীকাহু ফিল আসফারি ওয়া আমীনাহু আলাল আস্রারি আবা বাক্রিনিস্ সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্কা ওয়া আরদাকা জাযাকাল্লাহু আন্ উম্মাতি সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামা খায়রাল জাযা।

অর্থাৎ– হে আল্লাহ্র রাসূলের খলিফা! তাঁর গুহাসঙ্গী, সফরসমূহের সহযাত্রী এবং গোপনীয় বিষয়সমূহের বিশ্বস্ত রক্ষক আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)! আপনার প্রতি দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ আপনার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হোন এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করুন। সাইয়্যেদিনা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াআলীহী ওয়াসাল্লামের উপর উম্মতের পক্ষ হতে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর মাজার জিয়ারতের দোয়া ঃ

আস্সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীনা উমারুল ফারুক আল্লাযী আ'আয্যাল্লাহু

বিহিল ইসলাম, ইমামাল মুসলিমীনা মারদিয়্যান ওয়া হাইয়ান ওয়া মাইয়্যিতান রাদিআল্লাহু আনকা ওয়া আরদাকা জাযাকাল্লাহু আন উম্মাতি সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা খাইরা।

অর্থাৎ ঃ- অসংখ্য সালাম আপনার প্রতি হে মুমিনগণের নেতা উমর ফারুক (রাঃ)! যাঁর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীন-ইসলামের সম্মান বর্ধিত করেছেন। আপনি জীবিত-মৃত সব মুসলমানের নেতা। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি রাযী হোন এবং আপনাকে রাযী করুন। সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এর উম্মতের পক্ষ হতে আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

মহিলাদের জন্যও নির্দিষ্ট সময় রওজা মুবারক জিয়ারতের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ও সুযোগ রয়েছে।

মদীনা শরীফ জিয়ারত শুধু হজ্বের মৌসুমের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, জিয়ারত সারা বছরব্যাপী চলতে পারে। তবে কেউ হজ্বে উপস্থিত হয়ে মদীনা শরীফ জিয়ারত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি হজ্ব করে আমার জিয়ারত করেনি, সে যেন আমার প্রতি অবিচার করলো।" অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ আমার ওফাতের পর যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করবে, সে যেন আমার (সাথে) জীবিত অবস্থায় জিয়ারত (সাক্ষাৎ) করেছে। তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।" (তা'লিমুল হজ্ব, ওমরা ও যিয়ারত- আল্লামা শাইখ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর জব্বার রাহঃ)।

হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে : রাসূলে আকরাম (সা:) বলেছেন, " যে ব্যক্তি দূর হতে আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে (আল্লাহ্‌র ফেরেশেতাগণ) তার দরূদ ও সলাম আমার নিকট পৌঁছে দেন; আর যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে এসে আমার প্রতি সালাম ও দরূদ পাঠ করে, আমি তার সালাম ও দরূদ শ্রবণ করি এবং তার সালামের জবাব দিয়ে থাকি। (আবুশ শায়েখ)

অতএব আমাদের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা হওয়া উচিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) রেজামন্দী হাসিল করা।

মহানবী (সাঃ) এখানে বসেই আগত মেহমানদের অভ্যর্থনা জানাতেন, যা তাঁর হুজরার দরজার সামনে অবস্থিত ছিল
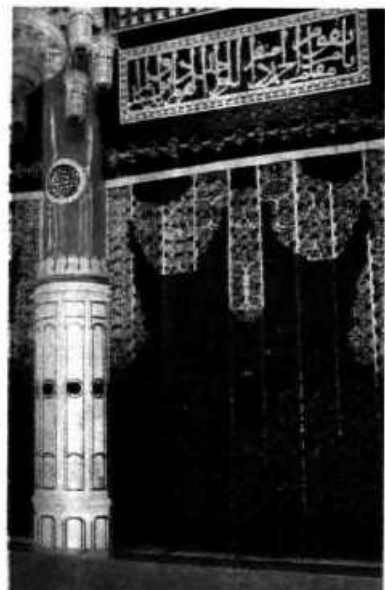
রাসূলে পাক (সাঃ) এখানেই প্রতি রমজানে এ'তেকাফ গ্রহণ করতেন, এর সাথেই (ভেতরে) ছিল মা আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর হুজরা

কু'বা মসজিদ
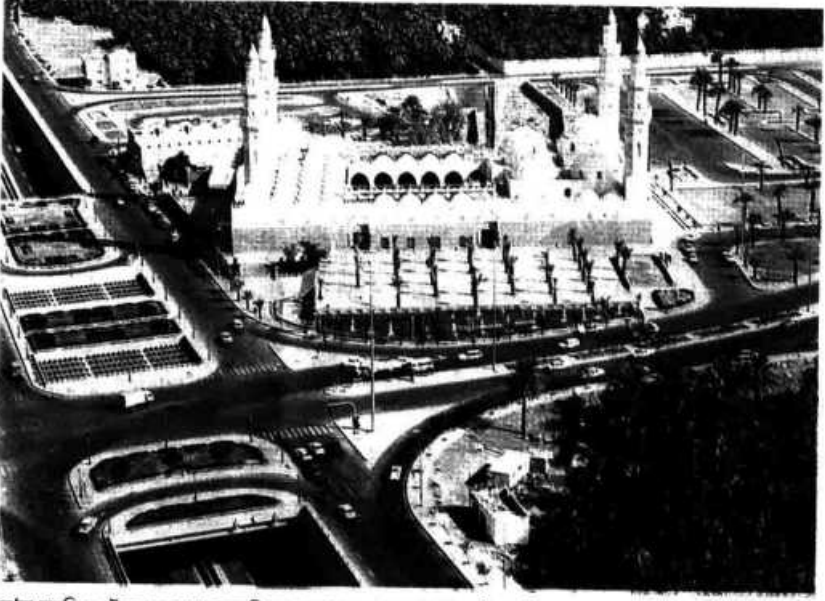
কু'বা মসজিদ। ইসলামের প্রথম মসজিদ, যা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর পরই নির্মাণ করেছিলেন

কু'বা মসজিদই ইসলামের প্রথম মসজিদ যা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর পরই নির্মাণ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর কালামে পাকে ঘোষণা করেনঃ "নিশ্চয়ই, যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত; ইবাদতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর জন্য সেটিই সর্বাধিক উত্তম।" (সূরা তাওবা ৯ : ১০৮)

রাসূল (সাঃ) মদীনা শরীফে হিজরত করার পর সর্বপ্রথম কু'বাতে[১১৭] যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে ছিল বনু আমর বিন আওফ গোত্রের কুলসুম বিন আল হাদমের গৃহ। তিনি সেখানে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে একটি মসজিদ তৈরি করেন এবং সেখানে নামায পড়েন।

সহি বর্ণনা মতে, তিনি সেখানে তাঁর সাহাবীগণসহ প্রকাশ্যে জামায়াতে সালাত আদায় করেন। আশ্ শামূস বিনতে আন্ নোমান বলেন ঃ তিনি রাসূল (সাঃ) কে সেখানে উপস্থিত হয়ে মসজিদ নির্মাণ করতে দেখেছিলেন, সে মসজিদটি ছিল কু'বার মসজিদ, তিনি তাঁকে মসজিদের পাথর বহন করতে দেখেছিলেন, পাথর বহন করতে করতে তাঁর পিঠ বাঁকা হয়ে পড়ছিল, তিনি তাঁর পেটে (অথবা তিনি বলেন নাভিতে) সাদা ধুলাবালি লেগে থাকতে দেখেছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর একজন পুরুষ সাহাবী এসে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (রাঃ)! আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক এটি আমাকে দিন, পাথরের এই বোঝা বহন করতে আমিই যথেষ্ট।" কিন্তু তিনি বললেন ঃ "না, বরং তুমিও এ রকম আর একটি নাও।" তিনি এভাবেই মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ

"নিশ্চয়ই হযরত জিবরাঈল (আঃ) কাবার দিকে মুখ করে থাকেন।" এবং বলা হয়ে থাকে যে এর কিবলা খুবই নিখুঁতভাবে তৈরি।

সর্বপ্রথম কু'বা মসজিদের কিবলা ছিল জেরুজালেমের (বায়তুল মুকাদ্দিসের) দিকে।

'মসজিদে কিবলা-তাইনে' এই কিবলা পরিবর্তনের স্মৃতি এখানো চিহ্নিত। পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীবকে (সাঃ) কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ার হুকুম দেন। ফলে লোকজন মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করতে চাইলেন। হুজুরে আকরাম (সাঃ) তাদের কাছে এলেন, কিবলা চিহ্নিত করে দিলেন এবং এর নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করলেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ যখন কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তন করে দেয়া হয় তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) কু'বা মসজিদে এলেন এবং তিনি মসজিদের একটি দেয়াল বর্তমানে যেখানে আছে সেখানে সরিয়ে আনলেন এবং তৈরি করলেন তার ভিত। এরপর রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ "হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে কাবামুখী হয়ে নামায পড়তে বলেছেন।" আল্লাহ্‌র হাবীব (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ (রাঃ) এই মসজিদ নির্মাণ করার জন্য পাথর বহন করেছেন।[১১৮]

কু'বা মসজিদের ফজিলত

কু'বা মসজিদের ফজিলত এত বেশি যে, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রাঃ) প্রতি শনিবার এখানে গমন করতেন এবং এটি ছিল হুজুরে আকরাম (সাঃ) এর সুন্নত।

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ "হযরত নবী করীম (সাঃ) প্রতি শনিবার হয় পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ারীতে আরোহণ করে কু'বা মসজিদে আসতেন।[১১৯]

কু'বা মসজিদের সম্মুখ ভাগ

হযরত সহল বিন হুনায়েফ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে কেউ এই মসজিদে অর্থাৎ কু'বা মসজিদে আসে এবং এখানে প্রার্থনা করে তা হবে তার জন্য ওমরা আদায়ের সমান (পুরষ্কার)।[১২০]

হযরত আমির বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং তার বোন আয়িশা বিনতে সা'দ উভয়ে তাদের পিতা সা'দ থেকে শুনেছেন ঃ "কু'বা মসজিদে ইবাদত করা আমার কাছে বায়তুল মুকাদ্দিসে ইবাদত করার চাইতে অধিক প্রিয়।"[১২১]

কু'বা মসজিদ মুসলমান এবং তাদের শাসকদের যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

হযরত উমর (রাঃ) একে পুনঃনির্মাণ করেন। হযরত উসমান (রাঃ)ও এর পুনঃনির্মাণ করেন এবং একে সম্প্রসারিত করেন। তিনি এর মেহরাবকে আরও দক্ষিণে সরিয়ে নেন।

হযরত উমর বিন আবদুল আযিয (রাহ্‌ঃ) মদীনার গর্ভনর থাকাকালে এটি পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি একে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন, উত্তর দিকে একে প্রশস্ত করেন এবং প্রথমবারের মত এতে একটি মিনার স্থাপন করেন। ১২৪৫ হিজরিতে সুলতান মাহমুদ দ্বিতীয় এর আমল পর্যন্ত এ মসজিদের পুনঃনির্মাণের কাজ চলে। তাঁর পুত্র আবদুল মজিদের সময়ও এর পুনঃনির্মাণ কাজ হয়। ১৩৮৮ হিযরীতে বাদশাহ ফয়সল বিন আবদুল আজীজ (রাহ্‌ঃ) এর পুনঃনির্মাণের আদেশ দেন। সে অনুযায়ী এখানে একটি নতুন ও মনোরম গৃহ নির্মাণ করা হয় এবং উত্তর দিকে মসজিদকে আরো সম্প্রসারিত করা হয়।[১২২]

এরপর ১৪০৫ হিজরীতে (১৯৮৫ইং) বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজীজ কু'বা মসজিদের সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণ করেন। এতে মসজিদের আয়তন বেড়ে দাঁড়ায় ১৩,৫০০ বর্গ মিটার। মসজিদে ৫৬টি ছোট গম্বুজ, ৬টি বড় গম্বুজ ও ৪টি মিনার সংযোজন করা হয়। এর বাইরে খোলা চত্বরের উপরে ভ্রাম্যমান বৈদ্যুতিক তাঁবু নির্মাণ করা হয়। এই মসজিদে বর্তমানে ২০ হাজার মানুষ একত্রে নামায পড়তে পারে।

মদীনা মুনাওয়ারার কয়েকটি ঐতিহাসিক মসজিদ

আল ইজাবা মসজিদ ঃ

আল ইজাবা মসজিদ

একে বনু মুয়াবিয়ার মসজিদও বলা হয়। কারণ এটি বনু মুয়াবিয়ার এলাকায় অবস্থিত। এই মসজিদের 'আল ইজাবা' নামকরণের কারণ হচ্ছে, রাসূলে পাক (সাঃ) এই মসজিদে বসে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তিনটি দোয়া করেছিলেন। তম্মধ্যে দু'টি দোয়া কবুল হয়।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত আমির বিন সা'দ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন ঃ "একদিন রাসূলে করীম (সাঃ) আল আলিয়া থেকে এলেন। বনু মুয়াবিয়া মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়লেন। আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তারপর তিনি তাঁর প্রভুর দরবারে দীর্ঘক্ষণ মুনাজাত করলেন।

অতপর তিনি আমাদের বললেন ঃ "আমি আমার রবের কাছে তিনটি প্রার্থনা করেছিলাম। তম্মধ্যে তিনি দু'টি গ্রহণ করেছেন এবং তৃতীয়টি স্থগিত রেখেছেন। আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছি যে, (১) ব্যাপক দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে আমার উম্মত যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। আল্লাহ তা কবুল করেছেন। আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছি যে, (২) তিনি যেন পানিতে ডুবিয়ে আমার উম্মতকে ধ্বংস না করেন। তিনি তা কবুল করেছেন। আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছি যে, (৩) আমার উম্মতের মধ্যে যেন পরস্পর রক্তপাত না ঘটে; কিন্তু তিনি তা কবুল করেন নি।[১২৩]

এই মসজিদটি বাদশাহ ফয়সল রোডের পূর্বপাশে অবস্থিত। (রুট নম্বর : ৬০) এবং এটি মসজিদে নববীর দ্বিতীয় সৌদী সম্প্রসারণের প্রান্তসীমা থেকে ৫৮০ মিটার দূরে। এর পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণ ঘটে বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজীজের আমলে ১৪১৮ হিজরীতে (১৯৯৭ খৃঃ)। এই মসজিদে একটি ছাদযুক্ত দালান রয়েছে। যার আয়তন ১,০০০ বর্গমিটার। মসজিদের সামনে ১৩.৭ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট গম্বুজ ও ৩৩.৭৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি মিনার আছে। এই মসজিদের সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণে ১৫ লক্ষ রিয়াল ব্যয় হয়েছে।[১২৪]

আল জুমুআ মসজিদ

আল জুমুআ মসজিদ

এই মসজিদটি আল জুমুআ নামে পরিচিত, কারণ মদীনায় হিজরতের সময় কু'বা পল্লীতে অবতরণ করে নবী করীম (সাঃ) এখানেই প্রথম জুমার নামায আদায় করেন। এই মসজিদের আরও কয়েকটি নাম রয়েছে ঃ মসজিদ আল বনু সালিম, মসজিদ আল ওয়াদি, মসজিদ আল গুরায়েত এবং মসজিদ আল আতিকা।

এই মসজিদ সম্পর্কে আয-জৈন আল মুরাগি (মৃত্যু ৮১৬ হিজরী) বলেন ঃ

"একদিন নবী করীম (সাঃ) কু'বা থেকে বের হলেন। সেদিন ছিল জুমাবার। সূর্য তখন মধ্য গগনে। আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) সালিম বিন আউফ এর এলাকায় পৌঁছলে জুমার ওয়াক্ত হল। রানুনা উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে তিনি জুমার নামায আদায় করলেন। তাই এ মসজিদকে মসজিদ আল ওয়াদি (উপত্যকার মসজিদ) এবং মসজিদ আল জুমুআ বলা হয়।[১২৫]

বাদশাহ্ ফাহাদ বিন আবদুল আজীজের আমলে এই মসজিদের সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণের কাজ শেষ হয়। এর আয়তন ১৬৩০ বর্গ মিটার। এতে ৬৫০ জন মুসল্লী একসাথে নামায পড়তে পারে। এতে ১২ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটি গম্বুজ আছে। এছাড়াও রয়েছে ৪টি ছোট গম্বুজ। আর আছে ২৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি মিনার। কু'বা মসজিদ থেকে এর দূরত্ব ৫০০ মিটার। যে জুমাবারে হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) এখানে জুমার নামায আদায় করেন ইসলামের ইতিহাসে সেটিই প্রথম জুমার দিন ছিল না। কারণ জুমার নামাযের হুকুম মক্কা শরীফেই নাযিল হয়েছিল। নিরাপত্তা ও কর্তৃত্বের অভাবে তিনি তা সেখানে আদায় করতে পারেননি। প্রথম জুমার নামায সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, মুসাব বিন উমায়ের (রাঃ) মসজিদে নববীর বর্তমান স্থানে সা'দ বিন খাইথামাহ্‌র ঘরে মদীনার লোকদের জড়ো করেছিলেন। মুসাবের পরে আসাদ বিন জুরারা জুমার নামাযে ইমামতি করেন। তারপর নবী করীম (সাঃ) মদীনায় পৌঁছলে তিনি বনু সালিমের মসজিদ আল জুমুআয় তাঁর সাহাবীদের নিয়ে প্রথম জুমার নামায আদায় করেন।[১২৬]

আল কিবলাতাইন মসজিদ

এটি বনু সালামা মসজিদ নামেও পরিচিত। কারণ মসজিদটি সালামা পল্লীতেই অবস্থিত। একে 'আল কিবলাতাইন বা দুই কিবলার মসজিদ' বলা হয়। কারণ এখানে রাসূলে পাক (সাঃ) এক রাকাত নামায বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে মুখ করে এবং আর এক রাকাত নামায কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আদায় করেছিলেন। আল বারাহ্ বিন আজীব (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে বলেন ঃ

রাসূল (সাঃ) বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে মুখ করে ১৬ বা ১৭ মাস নামায পড়েন। কিন্তু তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়া।

– বুখারী শরীফ।

আল কিবলাতাইন মসজিদের মিনার ও গম্বুজ

তাই সর্বশক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ "অবশ্যই আপনাকে আমরা আসমানের দিকে বার বার তাকাতে দেখেছি।" (সূরা বাকারা ২ঃ১৪৪)

আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী অনুযায়ী রাসূলে করীম (সাঃ) পবিত্র কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়া শুরু করলে মূর্খ লোকেরা, যাদের অধিকাংশ ছিল ইহুদী - তারা বলাবলি করতে লাগল ঃ

"কীসে তাদেরকে এত দিনকার কিবলা পরিবর্তনে বাধ্য করল? বলুন, (হে মুহাম্মদ সাঃ) পূর্ব পশ্চিম সব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন।"(সূরা বাকারা (২ঃ১৪২)

এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এর সাথে নামায পড়েছিলেন। নামায শেষে বেরিয়ে এসে তিনি এমন কিছু আনসারের সাক্ষাৎ পান যারা তখন বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে মুখ করে আসরের নামায আদায় করছিলেন। তিনি তাদেরকে সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলের (সাঃ) সাথে নামায পড়ে এসেছেন এবং তিনি কাবামুখী হয়ে নামায পড়িয়েছেন। অতপর লোকজন কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায আদায় করল।[১২৭]

অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলে করীম (সাঃ) বনু সালামা গোত্রের উম্মে বিশর বিন আল বারা' বিন মারুর ঘরে তশরীফ নিয়েছিলেন। উম্মে বিশর তাঁর জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন। তখন যোহরের ওয়াক্ত হল। আল্লাহ্‌র হাবীব (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে দু'রাকাত নামায পড়লেন, এরপর আসমানী নির্দেশ এলে কাবার দিকে ঘুরলেন এবং ড্রেইন (নর্দমার)

আল্ কিবলাতাইন মসজিদ। নতুনভাবে সংস্কারের সময় গাছ-গাছালি কর্তন করা হয়। বর্তমানে এর চারদিকে রয়েছে সবুজের মেলা।

পাইপের[১২৮] দিকে মুখ করলেন। ফলে এ মসজিদকে 'মসজিদে কেবলাতাইন' বা দুই কিবলার মসজিদ বলা হয়।[১২৯]

বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজীজ এ মসজিদের সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। মসজিদ গৃহটি দ্বিতল বিশিষ্ট। এ মসজিদের রয়েছে দু'টি মিনার ও দু'টি গম্বুজ। এর আয়তন ৩,৯২০ বর্গ ফুট। এর পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার কাজে ৩৯,৭,০০,০০০ রিয়াল ব্যয় হয়েছে।

বনু হারিসার মসজিদ
(মসজিদ আল মুস্তারাহ)

বনু হারিসা গোত্রের এলাকায় আনসার সম্প্রদায়ের অবস্থিতি বলে এ মসজিদকে বনু হারিসার মসজিদ বলা হয়। বর্তমানে একে মসজিদে আল মুস্তারাহ বলা হয় কেননা উহুদের ময়দান থেকে ফেরার পথে আল্লাহ্‌র হাবীব (সাঃ) এখানে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ অবস্থান করেছিলেন। সাইয়েদুস শোহাদা হযরত হামযা (রাঃ) এর[১৩০] কবরগাহ থেকে উদ্ভুত রাস্তার ডান পাশে মসজিদটি অবস্থিত।

বনু হারিসার মসজিদ (মসজিদ আল মুস্তারাহ)

এ মসজিদ নবী করীম (সাঃ) এর জীবদ্দশায় নির্মিত হয় এবং বনু হারিসার লোকজন এখানে সালাত আদায় করতেন। কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত হাদিস শরীফে এ মসজিদের বর্ণনা এসেছে। কারণ কিবলা পরিবর্তনের খবর যখন তাদের কাছে পৌঁছে তখন বনু হারিসা গোত্র এখানে আসরের নামায আদায় করছিলেন। হযরত তুওয়াইলাহ্ বিনতে আসলাম (রাঃ) এর বরাতে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ (আকাবার রাত্রিতে রাসূল সাঃ এর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণকারিনী মহিলাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম) তিনি বলেছেন ঃ বনু হারিসা মসজিদে আমরা আমাদের

যথাস্থানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলাম। তখন আব্বাস বিন বিশর কায়িজী বললেন ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন।"

তাই পুরুষেরা মহিলাদের স্থানে ও মহিলারা পুরুষের স্থানে কাতারবন্দী হল এবং এভাবেই কাবামুখী হয়ে তারা বাকী দু'রাকাত নামায শেষ করলেন।" আল হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী বলেন ঃ মদীনার অভ্যন্তর ভাগে যারা ছিল তাদের কাছে এ সংবাদ (কিবলা পরিবর্তনের - অনুবাদক) আসরের ওয়াক্তে পৌছেছিল - তারা ছিল বনু হারিসা গোত্র। আল বারার হাদিসে একথার উল্লেখ রয়েছে।[১৩১]

হযরত ইবরাহিম বিন জাফর (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) বনু হারিসার মসজিদে নামায পড়েছিলেন।[১৩২]

আল ফাতাহ্ মসজিদ

আল ফাতাহ মসজিদ

মদীনার উত্তরে সালা' নামীয় এক পাহাড়ে এ মসজিদ অবস্থিত। এ মসজিদটিকে আল ফাতাহ মসজিদ বলা হয়, কেননা এ মসজিদেই সর্বশক্তিমান ও পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালা খন্দকের যুদ্ধের বিজয় সংবাদ দান করেছিলেন।

আল্লাহ্‌র হাবীব (সাঃ) ঘোষণা করেন ঃ "আল্লাহ্‌র বিজয় ও সাহায্যের শুভ সংবাদে তোমরা আনন্দিত হও।"

এই মসজিদকে আহজাবের মসজিদও বলা হয়ে থাকে। কারণ রাসূলে করীম (সাঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে এখানে বসেই আরজি পেশ করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ! সম্মিলিত বাহিনীকে তুমি পরাজিত কর।"

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ নবী করিম (সাঃ) আল ফাতাহ মসজিদে তিনদিন দোয়া করেন ঃ সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবার। বুধবারেই দু' নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া কবুল হয়। তাঁর চেহারা মুবারকে সুসংবাদের চিহ্ন ফুটে ওঠেছিল।[১৩৩]

হারুন বিন কাসির তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত আল ফাতাহ মসজিদের মধ্যবর্তী পিলারের কাছে বসে নবীজী আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

হযরত উমর বিন আবদুল আযিয (রাহঃ) এ মসজিদ নির্মাণ করেন। ৫৭৫ হিজরী ও ১২৭০ হিজরীতে (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ) মিশরের গভর্নরেরা এ মসজিদ পুনঃনির্মাণ করেন। তুর্কী সুলতান আবদুল মজিদ-১ এ মসজিদের সংস্কার করেন। বাদশাহ্ ফাহাদ বিন আবদুল আজীজ এর পুরোপুরি সংস্কার সাধন করেন এবং মসজিদের চারদিকে একটি দেয়াল নির্মাণ করেন যা কাঠের জাফরী দিয়ে সজ্জিত।[১৩৪]

আল মিকাত মসজিদ

একে আশ শাজারাহ মসজিদও বলা হয়। শাজারাহ মানে গাছ। এ নামকরণের কারণ হচ্ছে মসজিদটি এমন এক স্থানে নির্মিত যার কাছাকাছি একটি গাছের নিচে নবীজী (সাঃ) বসে বিশ্রাম নিতেন।[১৩৫] জুল হুলাইফা নামক স্থানে অবস্থিত বিধায় এ মসজিদকে জুল হুলাইফার মসজিদও বলা হয়। মদীনার লোকজনের জন্য এ মসজিদই হচ্ছে মিকাত।[১৩৬] তাই একে আল মিকাত মসজিদও বলা হয়। এর আরেক নাম মসজিদ-এ-আল-ইহ্‌রাম।
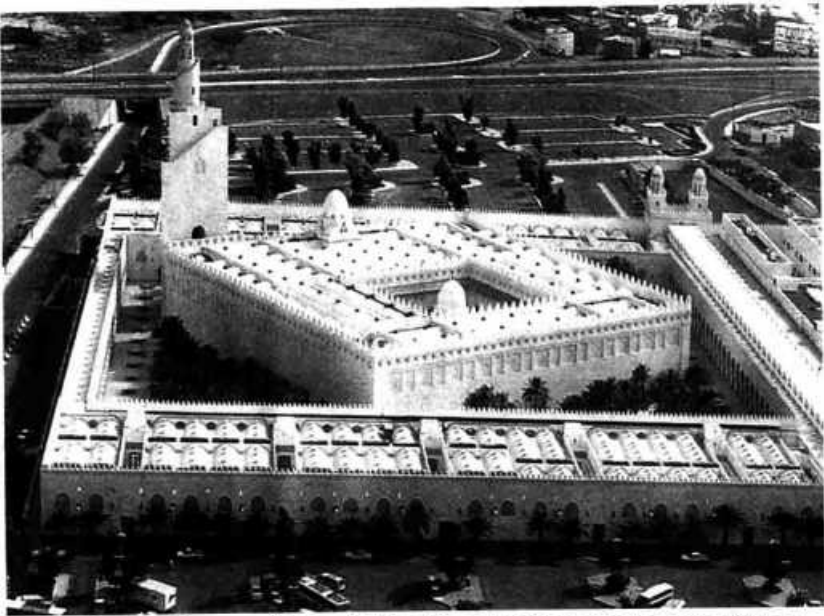
আল মিকাত মসজিদ। এ মসজিদ হতেই মদীনাবাসী এহরাম বেঁধে মক্কায় হজ্বের জন্য রওনা হন।

বর্ণিত আছে যে, এখানে নবী করীম (সাঃ) নামায পড়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) আল মুরারার রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং আশ শাজারাহ্‌র রাস্তা দিয়ে বের হতেন। যখন তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে বের হতেন তখন তিনি আশ শাজারাহ মসজিদে ইবাদত করতেন এবং যখন ফিরে আসতেন উপত্যকার মধ্যবর্তী জুল হুলাইফায় নামায পড়তেন। পরবর্তী সকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন।[১৩৭] হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) মধ্যবর্তী পিলারকে সামনে রেখে আশ শাজারাহ মসজিদে নামায পড়তেন; যা সেই গাছের কাছাকাছি স্থানে নির্মিত, যেদিকে ফিরে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) ইবাদত করতেন।[১৩৮]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায় যে, আশ শাজারাহ মসজিদ হুজুরে আকরাম (সাঃ) এর সময়েই বিদ্যমান ছিল। সেখানে তিনি ইবাদত করেছেন এবং সেখান থেকেই ইহ্‌রাম বেঁধেছেন। এও সম্ভব যে ৮৭ হতে ৯৩ হিজরীতে মদীনার গভর্নর থাকা কালে হযরত উমর বিন আবদুল আযিয (রাহঃ) এ মসজিদের সংস্কার সাধন করেছেন। কারণ এ কথা সুবিদিত যে, নবী করীম (সাঃ) যে সমস্ত মসজিদে নামায পড়েছেন সে সমস্ত মসজিদের পুনঃনির্মাণে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযিয (রাঃ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পরবর্তীতে মসজিদের অবস্থা জরাজীর্ণ হয়ে পড়লে ৮৬১ হিজরীতে (১৪৫৬ খৃষ্টাব্দ) জৈনি জৈন উদ্দিন আল ইসতিদার এর সংস্কার সাধন করেন। ওসমানীয় খিলাফত কালে ১০৯০ হিজরীতে (১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ) একজন ভারতীয় মুসলিম মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করেন।

তারপর বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজীজ এ মসজিদের সম্প্রসারণ কল্পে আশে পাশের ভূমি অধিগ্রহণ করেন। তিনি মসজিদের চারদিকের সৌন্দর্য বর্ধন, কার পার্ক নির্মাণ ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির প্রকল্প গ্রহণ করেন। মসজিদের বাইরে খোলা এলাকাসহ এর আয়তন হয়ে দাঁড়ায় ৯০,০০০ বর্গ মিটার। মসজিদ ও এর সংলগ্ন স্থাপনার আয়তন ২৬,০০০ বর্গ মিটার। বাকী ৩৪,০০০ মিটার জুড়ে রয়েছে রাস্তা, ফুটপাত, পার্ক ও বাগান। মসজিদে

রয়েছে টানাসারির বহুসংখ্যক গ্যালারী যার একটি থেকে অন্যটির দূরত্ব ৬ বর্গ মিটার। ১০০টি লম্বা গম্বুজ দিয়ে গ্যালারী গুলো আচ্ছাদিত। মসজিদের মেহ্রাবের উপর ২৮ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন একটি গম্বুজ এবং ৬৪ মিটার উচ্চ একটি মিনার রয়েছে। মসজিদের মেঝে তৈরি হয়েছে মার্বেল পাথর ও বিচিত্র বর্ণের গ্রানাইট পাথরে। দরজা সমূহে লাগানো হয়েছে 'টেকসই কাঠ' এবং তার ওপর স্বর্ণের কারুকাজ ও দরূদ সম্বলিত নবীজীর নাম। মসজিদ ও এর সংলগ্ন বিল্ডিংসমূহ কেন্দ্রিয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এখানে মসজিদের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বপাশে কোথাও একতলা, কোথাও দোতলা আবার কোথাও আণ্ডারগ্রাউণ্ড দোতলা ভবনে নির্মিত হয়েছে ৫১২ টি টয়লেট ও ৫৬৬ টি গোসলখানা। এর বেশ কয়েকটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে পৃথক ব্যবস্থা। ৩৮৪টি অজু খানায় নামাযীদের জন্য অজুর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। টয়লেট, অজু ও গোসলখানায় ওঠা-নামার জন্য রয়েছে সুপ্রশস্ত সিঁড়ি ও এস্কেলেটর। কার পার্কে ৫০০টি ছোট ও ৮০ টি বড় গাড়ি রাখা যায়। এতে ব্যয় হয়েছে ২০০ মিলিয়ন সৌদী রিয়াল। [১৩৯]

আল মুসাল্লা মসজিদ

এ মসজিদটি পবিত্র মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। বাবুস সালাম থেকে এর দূরত্ব ৫০০ মিটার। এ মসজিদটি এমন এক ময়দানে অবস্থিত যে ময়দানকে আল্লাহ্র পিয়ারা হাবীব (সাঃ) ঈদগাহ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এ ময়দানকে বলা হয় আল মুসাল্লা। মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র হায়াতে জিন্দেগীর শেষ বর্ষ সমূহে তিনি এখানেই ইবাদত-বন্দেগী করতেন। হযরত ইবনে সাব্বাহ (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) 'দার উশ শিফাতে' ঈদের নামায পড়েছেন, এরপর আদ দাউস জেলায় পরে আল মুসাল্লায়; এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর পিয়ারা হাবীবকে (সাঃ) স্বীয় সান্নিধ্যে ডেকে না নেয়া পর্যন্ত তিনি এখানেই ইবাদত কায়েম রেখেছিলেন।

আল মুসাল্লা মসজিদ (মসজিদে গামামা)

বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত আছে যে ঃ নবী করীম (সাঃ) ময়দানে আল মুসাল্লায় বৃষ্টির জন্য নামায পড়েছেন। হযরত আব্বাস বিন তামীম তাঁর পিতৃব্য থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (সাঃ) আল মুসাল্লার ময়দানে জামা উল্টিয়ে গায়ে দিয়ে কিবলামুখী হয়ে দু'রাকাত বৃষ্টির নামায পড়েছেন।[১৪০]

বিশ্বস্ত সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে ঃ আল মুসাল্লায় নবী করিম (সাঃ) আবিসিনিয়ার (বর্তমান ইথিয়োপিয়ার) রাজা নাজ্জাসীর[১৪১] জন্য সালাতুল গায়েব (গায়েবী নামায)[১৪২] পাঠ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলে করীম (সাঃ) নাজ্জাসীর মৃত্যুর দিন তাঁর মৃত্যুর সংবাদ লোকজনের মধ্যে প্রচার করেন এবং আল-মুসাল্লায় গিয়ে চার তকবীর পাঠ করেন।[১৪৩] (অর্থাৎ জানাযার নামায পড়ান - অনুবাদক)

যখনই মহানবী (সাঃ) কোন সফর হতে ফিরতেন তখন আল মুসাল্লা অতিক্রম কালে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং দোয়া করতেন।

আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে এখানে প্রতিষ্ঠিত মসজিদের নাম আল মুসাল্লা মসজিদ। বর্তমানে তা আল-গামামাহ মসজিদ নামে খ্যাত। বর্ণিত আছে হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) যখন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছিলেন তখন একখণ্ড মেঘ এসে তাঁকে ছায়া দান করেছিল। কিন্তু ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আব্দুল গণি তাঁর 'আল মসজিদ আল আসারিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর গবেষণা কর্ম চালনাকালে কোন প্রাচীন পুস্তকে তিনি এ নামের খোঁজ পাননি।

আল মুসাল্লা মসজিদের আয়তন ৭৬৩.৭ বর্গ মিটার। এর স্থাপত্য কৌশল খুবই দৃষ্টিনন্দন। মসজিদের বর্তমান ভবনটি উসমানীয় (তুর্কি) সুলতান আবদুল মজিদ-১ (১২৫৫ হিঃ - ১২৭৭ হিঃ) এর আমলে নির্মিত। তাঁর রাজত্বকাল খৃষ্টীয় ১৮৩৯ সাল থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এর পর হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে সুলতান আবদুল মজিদ-২ এর সংস্কার করেন। তাঁর রাজত্বকাল ১২৯৩ হিঃ থেকে ১৩২৭ হিঃ (১৮৭৬ খৃঃ - ১৯০৯ খৃঃ) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাম্প্রতিক কালে সৌদী সরকার ১৪১১ হিজরীতে (১৯৯১ইং) এ মসজিদের উসমানীয় স্থাপত্যকলার পরিবর্তন ঘটান। সম্পূর্ণ নতুন রূপে এটি পুনঃনির্মিত হয় বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজীজের আমলে।[১৪৪]

আল-ফাস মসজিদ

উহুদের পাহাড়ের কাছে গুহার নিচে একটি ছোট্ট মসজিদ আছে। বর্ণিত আছে যে, এখানে উহুদের যুদ্ধের দিন নবী করীম (সাঃ) যোহরের নামায আদায় করেছেন। গুফরাহ্ গোত্রের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস উমারের বরাত দিয়ে ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন যে, যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার কারণে মহানবী (সাঃ) উহুদের দিন বসে বসে যোহরের নামায আদায় করেছেন এবং মুসলমানরা বসেই তাঁর পেছনে নামায পড়েছেন। নিশ্চিত রূপে বলা যায় যে, মদীনার গভর্নর থাকা কালে হযরত উমর বিন আবদুল আযিয (রাহঃ)ই এ মসজিদটি নির্মাণ করেছেন।[১৪৫] পরবর্তী যুগের সংস্কার অনুযায়ী এর স্থাপত্যরীতি উসমানীয় বলে মনে হয়। বর্তমানে এর দেয়ালগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত। পূর্ব ও দক্ষিণের দেয়ালের কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। দক্ষিণের দেয়ালই সর্বাপেক্ষা উঁচু অবস্থায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

মদীনায় মসজিদে নববীর সন্নিকটে বাবুস্ সালাম এর দক্ষিণ -পশ্চিম দিকে কাছাকাছি এই তিনটি মসজিদ অবস্থিত; এর অদূরে (তামার বা খেজুর মার্কেটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) রয়েছে অত্যন্ত সুন্দর স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত হযরত বেলাল (রাঃ) মসজিদ

মসজিদে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)

মসজিদে হযরত উমর ফারুক (রাঃ)

মসজিদে হযরত আলী (রাঃ)

এ মাঠেই সংঘটিত হয়েছিল ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধ

পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারার উত্তরে উহুদ পর্বত অবস্থিত। মসজিদে নববী হতে মাত্র সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান। মদীনার সীমানা দেয়াল এ পাহাড়ের চারদিক বেষ্টন করে আছে। সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এটি হারামের অন্তর্ভুক্ত। কারণ হারামের সীমানা সওর পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত যা উহুদের উত্তরাংশের নিচে। উহুদের মাটি লালচে রংয়ের।

উহুদের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র হাবীব (সাঃ) বলেন ঃ "উহুদ এমন এক পর্বত যা আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও যাকে ভালবাসি।"[১৪৬]

বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এক হাদিসে হযরত আবু কিলাবা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সাঃ) কোন এক সফর হতে ফিরছিলেন। যখন উহুদ পাহাড় তাঁর সামনে এল তখন তিনি বললেন ঃ "এ এমন এক পর্বত যা আমাদের ভালবাসে এবং যাকে আমরাও ভালবাসি। আমরা প্রত্যাবর্তন করছি, তওবা করছি, আমাদের রবকে সিজদা করছি এবং তাঁর গুণগান করছি।"

ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধের পূর্বে হামরা আল্ আসাদ নামক এই পাহাড়ে শিবির স্থাপন করে রাসূলে পাক (সাঃ) তিন দিন অবস্থান করেছিলেন

"এটি আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি" – রাসূল (সাঃ) এর এ বাণী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সফর থেকে ফেরার পথে একে দেখে তিনি খুশী হয়েছেন কারণ তিনি তাঁর পরিবার

পরিজনদের কাছাকাছি এসে পৌছেছেন, তাঁদের সাথে মিলিত হবার সম্ভাবনা জেগে ওঠেছে এবং তা অবশ্যই ভালবাসার বিষয়। এও বলা হয়েছে যে, এ ভালবাসা বাস্তবেই ভালবাসা। ভালবাসাকে এখানে সোপর্দ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌র মহিমা পাহাড়ের ওপর নিপতিত হয়েছিল আর সে পাহাড় হযরত দাউদ (আঃ) এর সুরে সুর মিলিয়ে আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করেছিল অথবা যেভাবে পাথরের ওপর ভীতি ঢেলে দেয়া হয়েছিল।

বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হুজুরে আকরাম (সাঃ) একবার উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন। হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন ঃ একবার নবী করীম (সাঃ) উহুদের পিঠে আরোহণ করেছিলেন। সাথে ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত উসমান (রাঃ)। এতে উহুদ পাহাড় তাঁদেরকে নিয়ে কেঁপে ওঠল। তখন তিনি বললেন ঃ "হে উহুদ! স্থির হও, কারণ তোমার ওপর আরোহণ করেছেন একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ।" [১৪৭]

ঐতিহাসিক আইনাইন পাহাড়, যেখানে উহুদ যুদ্ধকালীন মহানবী (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে কিছু সৈন্যসহ পাহারায় নিয়োজিত করেছিলেন, কিন্তু গণিমতের মালের লোভে সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হলে মুসলমানদের বিজয় ছিনিয়ে নেয় খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মক্কার কাফের বাহিনী

এবং এ উহুদ প্রান্তরে সে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যেখানে হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) এর আপন চাচা সাইয়েদুশ্ শোহাদা বীর কেশরী হযরত হামযা (রাঃ) সহ সত্তর জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। এখানে হুজুরে আকরাম (সাঃ) এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিল, তাঁর চেহারা মুবারক আহত হয়েছিল এবং ঠোঁট কেটে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। সেদিন ছিল মুসলমানদের জন্য এক মহাপরীক্ষা ও ভয়াবহ মুসিবতের দিন। হিজরতের দু'বছর নয় মাস সাত দিন পর হিজরী ৩য় বর্ষে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। [১৪৮]

উহুদের ময়দানে শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে আবু দাউদ ও আল হাকীম সহিহ রেওয়ায়েতে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

রাসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের ভাইয়েরা উহুদের মাঠে পতিত হল আল্লাহ তাদের আত্মাকে সবুজ রংয়ের পাখির অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দিলেন। তারা বেহেশতের নহরের ওপর উড়ে বেড়াতে থাকল, বেহেশতের বাগান থেকে ফল ভক্ষণ করতে থাকল এবং আরশের ছায়া তলে নির্মিত সোনালী বাসায় আশ্রয় নিল। পানাহার ও বাসস্থানের চমৎকারিত্বে বিমুগ্ধ হয়ে তারা বলতে লাগল ঃ কে আমাদের ভাইদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আমরা বেহেশতে জীবিত আছি এবং রিজিক প্রাপ্ত হচ্ছি, যাতে তারা জিহাদে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি না জানায় এবং যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন না করে?"

মহা মহিমাময় আল্লাহ বললেন ঃ তোমাদের এ সুসংবাদ আমিই পৌছে দেব। তাই তিনি পবিত্র কুরআনে এরশাদ করলেন ঃ "যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলোনা (তারা জীবিত)।" (আলে-ইমরান ৩ ঃ ১৬৯)

উহুদ পর্বতের পাদদেশে সাইয়েদুশ শোহাদা হযরত হামযা (রাঃ) এর মাজার শরীফ। তিনিসহ ৭০ জন শহীদের কবরস্থান রয়েছে এখানে।

সহিহ্ আল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আট বছর উহুদের শহীদদের জন্য দোয়া করেছেন। মনে হচ্ছিল তিনি জীবিত ও মৃতদের বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। অতপর মিম্বরে আরোহণ করে তিনি বললেন ঃ "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য অগ্রগামী, তোমাদের জন্য একজন সাক্ষ্যদাতা এবং তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাতের প্রতিশ্রুত স্থান হবে আল-হউদ (আল কাউসার)।[১৪৯] উহুদের দক্ষিণ পার্শ্বে শহীদদের মাজার। সহিহ্ বর্ণনা মতে তাঁদের সংখ্যা ছিল সত্তর।

জান্নাতুল বাকী'

হাদিস শরীফের বর্ণনা মতে আল বাকী'র অর্থ হচ্ছে এমন এক স্থান যেখানে নানা প্রজাতির বৃক্ষের গুঁড়ি বিদ্যমান। আশ শানকিতি রচিত 'আদ দুররুস শামীন' গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ কবরস্তান তৈরি করার জন্য লোকজন এমন নরম মাটির সন্ধান করছিল যেখানে পাথর নেই। মদীনা মুনাওয়ারায় এমন ভূমি প্রচুর রয়েছে। যেমন ঃ বাকী' আল খলিল, বাকী' আয যুবায়ের এবং অন্যান্য। কিন্তু মদীনায় এ শব্দটি গোরস্থানের অর্থ ধারণ করে আছে। এটি পবিত্র মসজিদে নববীর পূর্ব দিকে অবস্থিত। হাররাতুল-আগওয়াত নামের এক বড় জেলার অন্তর্ভুক্ত। এ স্থানটিতে পবিত্র মসজিদে নববীর খাদেমগণ থাকতেন। মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ ও এর চারপাশে উন্মুক্ত চত্বর হিসেবে ব্যবহারের জন্য জেলার এ অংশ থেকে বসবাসকারীদের অন্যত্র সরিয়ে দেয়া হয়। তখন থেকে মসজিদে নববী ও আল বাকী'র মধ্যবর্তী স্থানে আর কোন অন্তরাল থাকেনি। এটি ১৪০৫ হিজরীর (১৯৮৫ইং) ঘটনা।[১৫০]

জান্নাতুল বাকী'র মর্যাদা

জান্নাতুল বাকী'র মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলে মকবুল (সাঃ) এর প্রচুর হাদিস রয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ যে রাত্রিতে তাঁর ঘরে হুজুর (সাঃ) এর পালা আসত সে রাত্রির শেষ প্রান্তে তিনি জান্নাতুল বাকী'তে যেতেন এবং বলতেন ঃ **"আস-সালামু আলাইকুম দারা কাওমীন মুমেনীন ওয়া আতাকুম মা তু'আদুন ঘাদান মুয়ায্যালান, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লা-হিকুন; আল্লাহুম্মাগফিরলি আহ্‌লি বাকী'ইল ঘারক্বাদ।"**

অর্থাৎঃ তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী মু'মিনগণ, তোমাদের কাছে যার প্রতিশ্রুতি ছিল আগামীকাল আসার তা কিছু পরে এসেছে এবং আল্লাহ চাহেন তো আমরা তোমাদের অনুগামী হব। হে আল্লাহ! আল ঘারক্বাদ গোরস্তানের (জান্নাতুল বাকী'র) বাসিন্দাদের আপনি ক্ষমা করে দিন।"[১৫১]

হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন ঃ যখন আমার সাথে আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) রাত যাপনের পালা আসত তখন তিনি পাশ ফিরে তাঁর লম্বা পরিধেয় বস্ত্র পরে নিতেন, পাদুকা খুলে নিতেন এবং সে সব আপন পদ মোবারকের কাছাকাছি স্থানে স্থাপন করতেন। চাদরের প্রান্তভাগ বিছানার ওপর বিছাতেন এবং যতক্ষণ তাঁর মনে হত আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ততক্ষণ পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন। তারপর তাঁর লম্বা জামা হাতে গুটিয়ে ধরে অতি ধীরস্থিরভাবে জুতা পরিধান করতেন। তারপর দরজা খুলতেন এবং আলতোভাবে তা বন্ধ করতেন। আমি মাথা ঢাকলাম, মুখাবরণ পরলাম এবং কোমর বন্ধ শক্ত করে বাঁধলাম। তারপর তিনি জান্নাতুল বাকী'তে পৌছা পর্যন্ত তাঁর পদক্ষেপ অনুসরণ করলাম। তিনি সেখানে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়িয়েই রইলেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। তিনি তিনবার তাঁর হাত মুবারক তুললেন তারপর ফিরলেন। আমিও ফিরলাম। তিনি তাঁর পদক্ষেপ দ্রুততর করলেন, আমিও আমার পদক্ষেপ দ্রুততর করলাম। তিনি দৌড়ালেন, আমিও দৌড়ে চললাম। তিনি পৌছলেন (ঘরে), আমিও পৌছলাম (ঘরে)। আমি অবশ্য তাঁর আগে আগে ছিলাম এবং গৃহে প্রবেশ করলাম। আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম, তিনিও গৃহে প্রবেশ করলেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কী হে, আয়িশা! তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস এত দ্রুত বয়ে যাচ্ছে কেন?" আমি বললাম ঃ "ও, কিছু না।" তিনি বললেন ঃ "আমাকে বল, নতুবা পরম দয়ালু ও করুণাময় সর্বজ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে তা জানিয়ে দেবেন।"

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবানী হোক। এবং অতপর আমি (সব ঘটনা) বললাম। তিনি বললেন ঃ তাহলে আমার সামনে যে ছায়া দেখছিলাম সে তুমি? আমি বললাম, 'হাঁ'। তিনি আমাকে বুকে চেপে ধরলেন। তাতে আমি ব্যথা অনুভব করলাম। তারপর তিনি বললেন ঃ তুমি কি মনে করেছিলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার সাথে অন্যায় আচরণ করবেন? আমি বললাম ঃ "মানুষ যা গোপন করে, সর্বশক্তিমান পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ তা অবশ্যই জানেন।" তিনি বললেন ঃ "তুমি যখন আমাকে দেখেছিলে তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং তোমার কাছ থেকে নিজেকে গোপন করলেন। আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং আমিও তা তোমার কাছ থেকে গোপন করলাম। (যেহেতু তিনি তোমার কাছে আসেননি) কারণ তুমি যথাযথ পোষাক পরিহিতা ছিলেনা। আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ এবং আমি তোমাকে জাগাতে চাইনি, আমার আশঙ্কা ছিল তুমি ভয় পাবে। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ "আপনি জান্নাতুল বাকী'তে যান এবং এর বাসিন্দাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" আমি বললাম, "হে আল্লাহ্‌র দূত! আমি তাদের জন্য কীভাবে প্রার্থনা জানাব?"

তিনি বললেন ঃ আপনি **"আসসালামু আ'লা আহলিদ দায়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীন ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুমুল লাহিকুন।"**

অর্থাৎঃ হে কবরবাসী! তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক যারা বিশ্বাসী ও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন যারা আমাদের মাঝে অগ্রবর্তী হয়েছে এবং যারা পরবর্তী সময়ে আসবে এবং আল্লাহ চাহেন তো আমরা শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হব।[১৫২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ হুজুরে আকরাম (সাঃ) বলেছেনঃ আমিই হব প্রথম ব্যক্তি যার জন্য দুনিয়া তার দরজা খুলবে; এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), এরপর হযরত উমর ফারুক (রাঃ), এরপর জান্নাতুল বাকী'র বাসিন্দাদের জন্য, তারা সবাই আমার সাথে একত্রিত হবে, তারপর দু' পবিত্র মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে আমি মক্কার লোকজনের জন্য অপেক্ষায় থাকব।[১৫৩]

মসজিদে নববীর পূর্ব- দক্ষিণ কোণে অবস্থিত জান্নাতুল বাকী'

জান্নাতুল বাকী'তে তৃতীয় খলিফা আমীরুল মুমিনীন শহীদ হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) সহ আল্লাহ্‌র নবীর প্রায় দশ হাজার সাহাবীকে (রাঃ) দাফন করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর সন্তানদের মধ্যে খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমাতুয যোহরা (রাঃ), হযরত রুকাইয়া (রাঃ), হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ), হযরত জয়নব (রাঃ), হযরত ইবরাহিম (রাঃ) এবং পরবর্তীতে নবীজীর প্রিয় দৌহিত্র, হযরত আলী ও মা ফাতিমার জ্যেষ্ঠপুত্র শহীদ হযরত ইমাম হাসান (আল্লাহ তাঁদের সবার ওপর সন্তুষ্ট থাকুন) এখানে শায়িত আছেন। কয়েকজন সালাফ (সাল্‌ফে সালেহীন) ও তাঁদের পরিবার পরিজন ছাড়া রাসূল (সাঃ) এর আর কোন্ কোন্ সাহাবী এখানে শায়িত আছেন তা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না।

মসজিদে নববী জিয়ারতকারীগণ; বিশেষত হাজী সাহেবান সুযোগ পেলেই জান্নাতুল বাকী' জিয়ারত করেন। এ সময় তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) এর কবরগাহের পাশে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা, ইখলাস ও দরূদ শরীফ পাঠের পর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করেন :

আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যেদানা উসমানাব্‌না আফ্‌ফান। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া মানিস্‌তাহ্‌য়াত্ মিন্‌কা মালাইকাতুর রাহ্‌মান। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া মান্‌যাইয়্যানাল কুরআনা বিতিলাওয়াতিহী ওয়া নাওওয়ারাল মিহ্‌রাবা বি-ইমামাতিহি ওয়া সিরাজাল্লাহি তা'আলা ফিল জান্নাহ। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া সা-লিসাল খুলাফাইর রাশিদীনা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আন্‌কা ওয়া আরদাকা আহ্‌সানাররিদা ওয়া জা'আলাল জান্নাতা মান্‌যিলাকা ওয়া মাস্‌কানাকা ওয়া মাহাল্লাকা ওয়া মা-ওয়াকা, আস্‌সালামু 'আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌।

অর্থাৎ ঃ সালাম আপনার উপর, হে আমাদের সরদার আফ্‌ফানের পুত্র উসমান! সালাম আপনার উপর যাকে আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তাগণও সমীহ করেছেন। সালাম আপনার উপর, যার তিলাওয়াত কুরআনকে অলঙ্কৃত করেছে, যার ইমামত মেহরাবকে আলোকিত করেছে আর যে বেহেশ্‌তে হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রদীপ। সালাম আপনার উপর, হে খুলাফায়ে রাশিদিনের তৃতীয় জন! আল্লাহ্ আপনাকে রাযী আর খুশী করেছেন চমৎকারভাবে, জান্নাতকে করেছেন আপনার গন্তব্যস্থল, আবাস আর আশ্রয়। বর্ষিত হোক আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহ্‌র করুণা ও বরকত।

তারপর সম্ভব হলে জান্নাতুল বাকী'র অন্যান্য কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জিয়ারতকারীগণ ফাতিহা, দোয়া-দরূদ এবং সালাম পেশ করেন।

সৌদী আমলে জান্নাতুল বাকী'র সম্প্রসারণ

প্রথম সম্প্রসারণ

সৌদী আমলে দু'দফা জান্নাতুল বাকী'র সম্প্রসারণ করা হয়। প্রথম সম্প্রসারণ ঘটে বাদশাহ ফয়সল বিন আবদুল আজীজ (রাহঃ) এর আমলে। তিনি জান্নাতুল বাকী' এর সাথে আল ঘারকাদ (৫,৯২৯ বর্গ মিটার) সংযোজন করেন। এটি আল বাকী' আল আম্মাত (৩,৪৯৩ বঃ মিঃ) ও আল জুকক এর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। আল জুককের অবস্থান ছিল আল বাকী' আল আম্মাত ও আল বাকী' আল ঘারকাদের মধ্যবর্তী স্থানে। এর আয়তন হচ্ছে ৮২৪ বঃ মিঃ। এর সাথে সংযোজিত হয় আল বাকী'র উত্তরাংশের একটি ত্রিভুজাকৃতির ভূমি। এ গোরস্তানটির চারপাশে একটি কংক্রীটের দেয়াল নির্মিত হয়। এর অভ্যন্তরে সিমেন্ট নির্মিত বিভিন্ন চলাচলের পথ তৈরি করা হয় যাতে বৃষ্টির দিনেও লাশ দাফন করা যায়।

দ্বিতীয় সম্প্রসারণ

পরবর্তীতে বাদশাহ্ ফাহাদের আমলে দ্বিতীয় দফা সম্প্রসারণ করা হয়। এতে সীমিত পরিমাণ জমি আল বাকী'র সাথে সংযোজন করা হয়। এরপর মোট আয়তন দাঁড়ায় ১,৭৪,৯৬২ বর্গ মিটার। ৪ মিটার উচ্চ ও ১,৭২৪ মিটার দীর্ঘ একটি সীমানা দেয়ালও নির্মাণ করা হয়েছে। এটি মার্বেল পাথরে সজ্জিত। পাথরগুলো ধনুকাকৃতি ও বর্গাকৃতির। কালো রংয়ের ধাতব গ্রীল দিয়ে এর মধ্যকার অংশগুলো ঢাকা। এর একটি প্রধান ফটক ও বহু উপযুক্ত ঢালু প্রবেশ পথ রয়েছে।[১০৪]

বর্তমানে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জান্নাতুল বাকী' জিয়ারতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। বাদ ফজর ও বাদ আছর পুণ্যার্থীগণ সারিবদ্ধভাবে জান্নাতুল বাকী'তে প্রবেশ করে শান্তিপূর্ণভাবে জিয়ারত কর্ম সম্পন্ন করেন।

মদীনা মুনাওয়ারার দারুল হাদিস স্কুল

এ জাতীয় বিদ্যালয় ১৩৫১ হিজরীতে (১৯৩০ইং) প্রতিষ্ঠিত হয়। সৌদী বাদশাহ্ আবদুল আজীজ (রহঃ) এ বিষয়ে সদয় সম্মতি প্রদান করেন। যাতে করে এটি ঈমানের সত্যিকারের বিষয়গুলো শিক্ষার যথাযথ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। যাতে করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা যায়। তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখান ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যাতে করে মুসলিম সন্তানগণ যারা মক্কা ও মদীনা ভ্রমণ করে তারা পূর্বসুরী পুণ্যশীলদের বিশ্বাসের কথা, ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম উৎস পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি জানতে পারে এবং নিজ নিজ দেশের জনগণের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের কল্যাণ করতে পারে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র খেদমতে এ স্কুল যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালায়। এতে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা খুবই উপকৃত হয়েছে।

এ স্কুলের নিম্নোক্ত ধাপগুলো রয়েছে ঃ

১. ছয় বছর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা স্তর,

২. তিন বছর ব্যাপী মাধ্যমিক স্তর,

৩. তিন বছর ব্যাপী উচ্চ মাধ্যমিক স্তর,

৪. চার বছর ব্যাপী উচ্চতর স্তর।

স্কুল কমিটির প্রধান ছিলেন সৌদী আরবের তৎকালীন গ্রান্ড মুফতী শাইখ আবদুল আযিয বিন বা'য (রাহঃ)। তিনি আজীবন এর উন্নয়নে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে যথেষ্ট আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি এ স্কুলকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করার জন্যও প্রচেষ্টা চালান। শেষ পর্যন্ত ১৩৮৪ হিজরীতে (১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ) এটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা'র অধিভুক্ত হয়। শাইখ বা'যের ইন্তেকালের পর সৌদী আরবের গ্রান্ড মুফতী শাইখ আবদুল আযিয বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আ'ল আশ-শাইখ দারুল হাদিসের কমিটি প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা মুনাওয়ারার প্রশাসনিক ভবন

সৌদী সরকাররের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত এটি একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২৫শে রবিউল আউয়াল ১৩৮১ হিজরীতে (১৯৬১ খৃঃ) এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ফাহাদ বিন আবদুল আজীজ ছিলেন সৌদী যুবরাজ (ক্রাউন প্রিন্স)। বর্তমানে রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে তিনি এর প্রধান পরিচালক বা চেন্সেলর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১. ইসলামী চেতনার লালন-পালন ও পরিচর্যা;

২. পবিত্র কুরআনের আলোকে বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক রচনা প্রস্তুত, অনুবাদ ও বিতরণ;

৩. ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কিত গ্রন্থ সংগ্রহ, পরীক্ষণ ও প্রকাশনা;

৪. ইসলামী বিজ্ঞান ও আরবী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি; যাঁরা ধর্মীয় বিষয়ে বিচারকের ভূমিকা পালন করতে পারেন;

৫. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ইসলামের সেবা কল্পে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন প্রতিষ্ঠা ও মজবুতকরণ।[১৫৫]

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কিছু সংখ্যক কলেজ রয়েছে। যেমন ঃ কলেজ অব শরীয়া, কলেজ অব দাওয়া, ধর্মের মৌলিক শিক্ষা, কলেজ অব দি নোবেল কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা, আরবী ভাষা ও সাহিত্য কলেজ, কলেজ অব হাদিস ও ইসলামী শিক্ষা। এ সমস্ত কলেজে ৪ বছর মেয়াদী শিক্ষা (অনার্স) কোর্স চালু আছে।

নিম্নলিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ঃ

১. মাধ্যমিক স্কুল ইনস্টিটিউট,

২. উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ইনস্টিটিউট,

৩. অনারবদের (আজমী) আরবী ভাষা শিক্ষা বিভাগ,

৪. মদীনা মুনাওয়ারার দারুল হাদিস,

৫. মক্কা মুয়াজ্জামার দারুল হাদিস।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা মুনাওয়ারার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ভবন

বিশ্বের ১৩৮টি দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে। শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা হয়। অনেককে দেয়া হয় মাসিক বৃত্তি। স্কলারশীপ প্রাপ্ত ছাত্রদের নিজ দেশ থেকে আসার জন্য বিমান ভাড়া দেয়া হয়। গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভের পর ও গ্রীষ্মের ছুটিতে ছাত্রদের স্ব স্ব দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রদের বিনা ভাড়ায় বাসস্থান, খাদ্য, যাতায়াত খরচ, বই-পুস্তক ও চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ১৪১৭ হিজরীতে (১৯৯৮ খৃঃ) ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫,০১৭ জন। তম্মধ্যে অনারব ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৭১%। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষা কোর্সে অনারব ছাত্র সংখ্যা ৬৬% এবং অন্যান্য কোর্সে ৩৪%।

১৩৯৫ হিজরীতে (১৯৭৪ খৃঃ) উচ্চতর শিক্ষাকোর্স খোলা হয় যেখান থেকে স্নাতকোত্তর অর্থাৎ এম.এস.এস.; এম.এ; এম.এসসি. ডিগ্রী এবং উচ্চতর গবেষণা কর্ম সুসম্পন্নের পর পিএইচ. ডি. বা ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

মদীনা মুনাওয়ারার দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

মদীনা মুনাওয়ারায় বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নিম্নে সেগুলোর মধ্য হতে মাত্র কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হল ঃ

জামিয়াতুল বী'র

সৌদী আরবে প্রতিষ্ঠিত এ ধরনের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মদীনা মুনাওয়ারার জামিয়াতুল বী'রই প্রথম। মদীনা মুনাওয়ারার বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবার পর ১৩৭৯ হিজরীতে (১৯৫৮ খৃঃ) এর প্রতিষ্ঠা হয়। 'আল মদীনা' পত্রিকায় এ সময় একটি 'কল্যাণ তহবিল' প্রতিষ্ঠার আহ্বানও জানানো হয়েছিল। এ তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল অভাবী, গরীব, দুঃস্থ, বিধবা, এতিম; যারা মূলত অভিভাবক হীন ও যাদের ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে এ আহ্বান ব্যাপক সাড়া জাগায়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শহরে এর প্রভাব পড়ে। ক্রমশ প্রতিটি শহর, নগর ও বন্দরে এ ধরনের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং এক সময় তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সর্বস্তরের জনগণ

যেমন প্রিন্স, প্রশাসক, ব্যবসায়ী, ধনিক শ্রেণী ও সামর্থবান ব্যক্তি এবং অন্যান্য সকল শ্রেণী এ সমস্ত সামাজিক সংগঠনে অংশগ্রহণ করে। সরকারও এ ধরনের উদ্যোগ ও মনোভঙ্গিকে স্বাগত জানায় এবং বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে। তবে এগুলো আধা সরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবতার খেদমতে কাজ করা এবং প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাকে জনসাধারণের পাশে দাঁড়ানো। তম্মধ্যে কয়েকটির কথা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১. অভাবী, গরীব, ঋণগ্রস্ত ও মুসাফিরদের আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য প্রদান করা,

২. গরীব, এতিম ও প্রতিবন্ধীদের সেবার জন্য দাতব্য সংগঠন যেমন ঃ হাসপাতাল, আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুল, সেবিকাসদন ও চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলা,

৩. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে সরকারী ও সামাজিক সংগঠন সমূহের সাথে একযোগে কাজ করা,

৪. সোসাইটির প্রশাসনিক বোর্ড কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করা।[১৫৬]

মহিলাদের জন্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান

এ সমস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র পুরুষদের মাঝে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেনি। এ ধরনের বহু মহিলা সংগঠন আছে যেগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কল্যাণ সোসাইটির মত একই। তদুপরি মহিলাদের ব্যাপারে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্ব পালনে এগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে। মদীনা মুনাওয়ারার এ ধরনের সংগঠনের নাম 'জমিয়তে তায়্যি'বিয়া আল খায়রিয়্যাই আন নিসাঈয়া'। এর প্রতিষ্ঠা কাল ১০ই সফর ১৩৯৯ হিজরী (১৯৭৯ খৃঃ)।

এ সংগঠন পরিচালনার জন্য কিছু সংখ্যক সাধারণ কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রশাসনিক বোর্ডের এক একজন সদস্য এ সমস্ত কমিটির প্রধান। এ সমস্ত কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা এবং নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, স্বাস্থ্যগত, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চেতনাবোধ বিস্তৃত করা।

এ ধরনের সামাজিক সংগঠনের কাজ নিম্নরূপ ঃ

১. শিশুদের স্কুল শুরুর বয়স পর্যন্ত পরিচর্যা করার জন্য সেবা সদন প্রতিষ্ঠা,

২. পিতামাতাহীন শিশুদের জন্য পালক পিতার (দত্তকের) ব্যবস্থা করা,

৩. এতিমদের পরিচর্যা,

৪. প্রতিবন্ধীদের পরিচর্যা,

৫. অভাবী পরিবারের জন্য আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

সাংস্কৃতিক লক্ষ্য ঃ

১. নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে ক্লাস চালু করা,

২. ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য ক্লাস চালু করা,

৩. মহিলাদের মধ্যে সাংস্কৃতিকবোধ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা।

স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক লক্ষ্য ঃ

১. চিকিৎসা সেবার উদ্দেশ্যে ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা,

২. বক্ষব্যাধি (হৃদরোগ) নিরসনে সহায়তা প্রদান ও রোগীদের কল্যাণার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ,

৩. পক্ষাঘাতগ্রস্ত (প্যারালাইসিস) রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা ও কল্যাণ সাধন।

মেয়েদের কারিগরী শিক্ষা বিষয়ক লক্ষ্য ঃ

১. সেলাই, পোষাক তৈরি, রান্না-বান্না শিক্ষা ও কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ,

২. শিক্ষণ প্রশিক্ষণ ও টাইপ (কম্পিউটার প্রোগ্রাম) শিক্ষা প্রদান।[১৫৭]
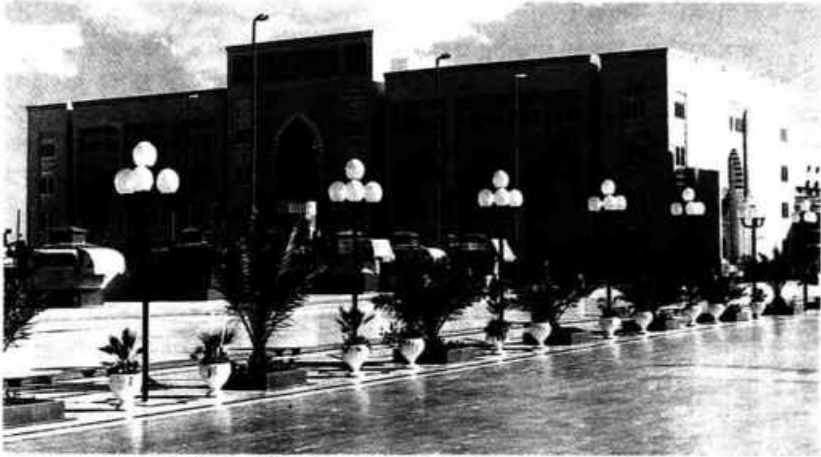
মসজিদে নববীর দক্ষিণ পার্শ্বে নবনির্মিত শরিয়া আদালত (কুরআনি আইন বাস্তবায়ন) ভবন

মদীনা মুনাওয়ারার লাইব্রেরীসমূহ

মদীনা মুনাওয়ারায় বহুসংখ্যক লাইব্রেরী রয়েছে। কিছু কিছু লাইব্রেরী সবার জন্য উন্মুক্ত। কিছু আছে ব্যক্তিগত লাইব্রেরী যা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্ত। নিচে কিছু লাইব্রেরীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল ঃ

১. আল মক্তবা আল মাহমুদিয়া ঃ

মদীনা মুনাওয়ারার লাইব্রেরীগুলোর মধ্যে বইয়ের সংখ্যা, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং সুনামের দিক দিয়ে আল মক্তবা আল মাহমুদিয়ার স্থান দ্বিতীয়, মক্তবা আ'রিফ হিকমতের পরেই। ১২৩৭ হিজরীতে (১৮২১ খৃষ্টাব্দ) উসমানীয় (তুর্কি) সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ-এ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। কুয়েতবে'র (মিশরীয় খলিফার) আমলে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে তিনি এ লাইব্রেরীকে সম্পৃক্ত করে দেন। সুলতান মাহমুদ এবং কুয়েতবে এটিকে মদীনার জ্ঞান পিপাসু ছাত্রদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। এ লাইব্রেরী মসজিদে নববীর পশ্চিম পাশে বাবুস্ সালামের কাছাকাছি স্থাপিত ছিল। অতপর এটিকে মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে স্থানান্তর করা হয়। পশ্চিম দিক থেকেও একে সরিয়ে আনা হয় যাতে মদীনা মুনাওয়ারার পাবলিক লাইব্রেরী সমূহের মধ্যে এর স্বতন্ত্র ও নিজস্ব স্থায়ী বিল্ডিংয়ের ব্যবস্থা হয়। এটির স্থান হয় মসজিদের নববীর প্রবেশদ্বার বাবুস্ সিদ্দিকের বিপরীত দিকে।

পরে এটিকে মক্তবা আল মালিক আবদুল আজীজ' এ স্থানান্তর করা হয়। এ লাইব্রেরীতে বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এদের সংখ্যা ৩,৩১৪ টি। হাদিস শরীফের প্রথিতযশা পণ্ডিত শাইখ মুহাম্মদ আবিদ আস সিন্ধি (রাহঃ) এ সমস্ত পাণ্ডুলিপি দান করেন।

২. মক্তবা আ'রিফ হিকমত

মদীনা মুনাওয়ারার লাইব্রেরী সমূহের মধ্যে যেটি গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষণে ধন্য হয়েছে তা হচ্ছে মক্তবা আ'রিফ হিকমত। শাইখুল ইসলাম আহমদ আ'রিফ হিকমত ১২৭০ হিজরীতে এ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। এতে তিনি তাঁর সমস্ত বই দান করেন; পরিমাণে যা ৫,০০০ ভল্যুমেরও অধিক। বহু অমূল্য পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের কারণে এ লাইব্রেরীটি খ্যাতি অর্জন করেছে। এর সুশৃঙ্খল সংরক্ষণ পদ্ধতি ও যথাযথ তত্ত্বাবধান একে মদীনা মুনাওয়ারার সুন্দরতম লাইব্রেরীতে পরিণত করেছে। ব্যক্তি পর্যায়েও অনেকে এখানে অনেক বই দান করেছেন।

৩. মক্তবা আল মসজিদ আন নববী

আস সাইয়্যিদ 'উবাইদ মাদানীর প্রস্তাবনা ও পরামর্শে ১৩৫২ হিজরীতে পবিত্র মসজিদে এ লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়। প্রথমত মসজিদে নববীর উপর তলায় এটি স্থাপিত হয়েছিল। মসজিদ সম্প্রসারণ কালে লাইব্রেরীটি পূর্বের স্থান থেকে সরিয়ে ওয়াক্‌ফকৃত লাইব্রেরী কমপ্লেক্সে পুনঃস্থাপন করা হয়। এখানে রয়েছে 'আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারা পাবলিক লাইব্রেরী' এবং 'আল মাহমুদিয়া।' অতপর ১৩৯৯ হিজরীতে লাইব্রেরীটি তার বর্তমান স্থানে অর্থাৎ মসজিদে নববীর দক্ষিণ পাশে বাব-এ-উমর বিন আল খাত্তাবের বিপরীতে স্থাপন করা হয়। লাইব্রেরীটি প্রথমে মদীনার ওয়াক্‌ফ বিভাগের অধীনে ছিল। পরে তা হারামাইন শরীফের জেনারেল ডিরেক্টরেট এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ব্যক্তিগত ও ওয়াক্‌ফকৃত লাইব্রেরীর অনুদানে এ লাইব্রেরী সমৃদ্ধ হয়েছে।

৪. মদীনা মুনাওয়ারা পাবলিক লাইব্রেরী

এ লাইব্রেরীটি তুলনামূলকভাবে নতুন। ব্যক্তি পর্যায়ে ও স্কুল লাইব্রেরী সমূহের অনুদানে এ লাইব্রেরীটি গড়ে ওঠেছে। এর প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, সাজসজ্জা ও আসবাবপত্র সরবরাহের যাবতীয় কৃতিত্ব জনাব শাইখ জা'ফর ফকীহ -এর। ১৩৮০ হিজরীতে (১৯৬০ খৃষ্টাব্দ) এ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদে নববীর দক্ষিণে আওকাফ লাইব্রেরী প্রকল্প এলাকায় এর ভবন অবস্থিত। এটি এর আগে মদীনার ওয়াক্‌ফ বিভাগের অধীনে ছিল। এখানে মোট বইয়ের সংখ্যা ১২,২৫২ টি। তম্মধ্যে কিছু সংখ্যক বই ছাপানো আর কিছু হচ্ছে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি।[১৫৮]

রাসূলে পাক (সাঃ) এর প্রিয়তম সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বসতভিটা এ পল্লীতেই ছিল

নিরাপত্তা প্রাচীর বেষ্টিত পবিত্র মদীনা শরীফ, ১৯০৭ খৃঃ তোলা ছবি

পবিত্র কুরআন শরীফ মুদ্রণ প্রকল্প কমপ্লেক্স এর কেন্দ্রীয় মসজিদ

ইসলামের সার্বজনীন বিষয়ে সযত্ন আগ্রহের অংশ হিসেবে সৌদী আরব আল্লাহ্‌র কিতাবের পরিচালন, তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ, মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান। এ লক্ষ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি হিসেবে মৌলিক উদাহরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে পবিত্র কুরআন মুদ্রণের জন্য গৃহীত মদীনা মুনাওয়ারার বাদশাহ ফাহাদ প্রকল্প। এ প্রকল্প সারা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম প্রকল্পগুলোর অন্যতম হিসেবে পরিগণিত। এটি বৃহদাকার এক ইসলামী প্রতিষ্ঠান। এ প্রকল্প আধুনিক কালের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। একে এক অনন্য সংস্থারূপেও গণ্য করা হয়। ইতিহাসের অতীত পৃষ্ঠায় এর কোন দ্বিতীয় নজির নেই। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত সুবিশাল মুসলিম দুনিয়ায়ও এর সমকক্ষ কোন প্রতিষ্ঠান নেই। মহান পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অনন্য কিতাবের খেদমতের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান মুসলিম উম্মাহ্‌র এক বিরাট শূন্যতাকে পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে।

'কুরআন মুদ্রণ প্রকল্পের' স্থান হিসেবে পবিত্র নগরী মদীনা মুনাওয়ারাকে বেছে নেয়ার মূল কারণ হচ্ছে, প্রকৃত প্রস্তাবে এটি কুরআনের শহর। এখানেই কুরআন লিপিবদ্ধ হয়েছে, এখানেই কুরআনের লিখিত রূপকে যাচাই করা হয়েছে এবং এখান থেকেই তা দেশে দেশে বিতরণ করা হয়েছে। বাদশাহ ফাহাদ ১৬ই মুহাররম ১৪০৩ হিজরী (২রা নভেম্বর, ১৯৮২ খৃঃ) এ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৪০৫ হিজরীর সফর মাস (অক্টোবর, ১৯৮৪) হতে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। মদীনা মুনাওয়ারার তাবুক রোডে ২,৫০,০০০ বর্গ মিটার জায়গা জুড়ে এ প্রকল্পের সীমানা বিস্তৃত। স্থাপত্য শৈলীর ক্ষেত্রে এ প্রকল্প একটি মাইল ফলক। সমস্ত পৌর সুবিধাদিসহ এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকল্প। এখানে রয়েছে প্রশাসনিক ভবন, রক্ষণাবেক্ষন বিভাগ, ছাপাখানা, গুদাম, বিপণন বিভাগ, ট্রান্সপোর্ট ও আবাসিক ভবন। এছাড়া রয়েছে মসজিদ, ক্লিনিক, লাইব্রেরী ও রেস্টুরেন্টসমূহ।

আগেই বলা হয়েছে, সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র কিতাবের খেদমতে, তাঁর হাবীবের (সাঃ) সুন্নতের প্রসার ও প্রচারে এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রয়োজনে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে 'বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প' নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সংক্ষেপে এ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ

১. পরিপাটি ও নিখুঁতভাবে এবং যত্নসহকারে পবিত্র কুরআন ছাপানো,

২. কুরআনের অনুবাদ ও বিভিন্ন ভাষায় তা ছাপানো, যাতে মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণ হতে পারে,

৩. প্রখ্যাত তিলাওয়াতকারীদের দ্বারা কুরআন শরীফের তিলাওয়াতের ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি বের করা ও বিশ্বব্যাপী তা প্রচার করা,

৪. সুন্নাহ্‌র প্রকাশ ও প্রচার এবং সীরাত গ্রন্থ প্রকাশ। পাণ্ডুলিপি ও রেফারেন্স বই, সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংরক্ষণ এবং অনুশীলন পত্র ও ব্যাপক ভিত্তিক রচনা প্রস্তুত করা,

৫. দুই পবিত্র মসজিদ (মক্কা ও মদীনা) সহ অন্যান্য মসজিদ ও মুসলিম বিশ্বের বই-পত্রের; বিশেষ করে কুরআন শরীফের চাহিদা পূরণ করা,

৬. কুরআন, সুন্নাহ ও রাসূলে পাক (সাঃ) এর জীবন চরিত ভিত্তিক জ্ঞান চর্চার অনুশীলন ও গবেষণা কর্ম পরিচালনা এবং কুরআন শরীফ ও কুরআন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদি প্রকাশে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়া।

এ মুদ্রণ কাজ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ঃ

প্রত্যেক শাখা যোল পাতার দায়িত্বে নিয়োজিত। ইলেকট্রনিক মুদ্রণ যন্ত্রের মাধ্যমে শুরু হয় নানা ধাপে এর ছাপার কাজ। যদিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুরআনের মুদ্রণ বিন্যাসের জন্য কম্পোজের (Computer type Setting) এর প্রয়োজন পড়েনা, কারণ গ্রহণযোগ্য নানা স্টাইলে পবিত্র কুরআনের সমস্ত পাণ্ডলিপি সুদক্ষ লিপিকারের (কাতেব) দ্বারা হস্তলিখিত। হস্তলিখিত পাণ্ডলিপিটি কম্পিউটার স্ক্যান ও ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফিল্ম ও প্লেট মেকিং-এর পর ছাপার কাজ সম্পন্ন করা হয়। অতপর চূড়ান্ত কপিটি পাওয়া যায়। তারপর বাঁধাইয়ের কাজ করা হয়।

মুদ্রণ কাজে যাতে কোন ভুল-ভ্রান্তি না থাকে তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া হয় ঃ

এক. প্রথমত নির্ধারিত পাঠটি অনুমোদন কমিটি ছাপানোর ছাড়পত্রসহ নির্ধারিত শাখাকে দিয়ে দেয়। শাখা কর্তৃক তৈরি কপিটি একদল বিশেষজ্ঞ অনুমোদন কমিটির ছাড়কৃত পাঠটির সাথে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে মিলিয়ে দেখে। পুরো পাঠটির বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হবার পরই মুদ্রণ শাখাকে লিখিত ছাড়পত্রসহ মুদ্রণের অনুমতি দেয়া হয়।

দুই. সুনির্দিষ্ট সময়ে মুদ্রণ কাজ চলা কালে (ধরা যাক ৭টার সময়) প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর ছাপানো কপি মেশিন থেকে নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি যাচাই করতে থাকেন, যাতে তা মুদ্রণ ত্রুটি বা মুদ্রণ অস্পষ্টতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে।

তিন. যখনই কোন ত্রুটি ধরা পড়ে সাথে সাথে মেশিন বন্ধ করা হয় এবং তা সংশোধন করা হয়।

চার. তত্ত্বাবধান শাখা প্রতিটি মুদ্রণ শাখার ভুলগুলো তালিকাভুক্ত করে এবং সে সব প্রতিবেদন চূড়ান্ত তত্ত্বাবধান কমিটির কাছে পেশ করে, যাতে তাঁরা নিশ্চিত হতে পারেন যে চূড়ান্ত কপিতে ত্রুটিগুলো সংযোজিত হয়নি অর্থাৎ নির্ভুলভাবেই ছাপার কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে।

পাঁচ. মুদ্রণ শেষ হলে, বিভিন্ন মুদ্রণ শাখা সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে মুদ্রিত ফর্মাগুলো হস্তান্তর করে। সেখানে কপি (ফর্মা) গুলোর একত্রীকরণ, সেলাই ও বাঁধাইয়ের কাজ হয়। একদল বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে এসব কাজ সম্পন্ন হয় যাতে কোন ধরনের ত্রুটির আশঙ্কা না থাকে।

ছয়. কুরআন শরীফের বাঁধাইকৃত কপিগুলো পরিবহন চ্যানেলে রাখা হয়। এক এক চালানে ৯০০ করে কপি থাকে।

সাত. মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক শাখা প্রতিটি ব্যাচ থেকে নমুনা কপি সংগ্রহ করে এবং

পবিত্র কুরআন শরীফ মুদ্রণ প্রকল্প কমপ্লেক্স এর প্রবেশ পথ ও কেন্দ্রীয় মসজিদ

প্রতিটি পৃষ্ঠা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করে। যদি কোন অসম্পূর্ণতা কিম্বা ত্রুটি ধরা পড়ে সাথে সাথে তা সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক শাখাকে জানিয়ে দেয়া হয়।

আট. পরিবহন চ্যানেলগুলো সর্বোচ্চ তত্ত্বাবধায়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সেখানে ৭৫০ জন পরীক্ষাকারী রয়েছেন যাঁরা মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক বিভাগের নির্দেশগুলো পালনে তৎপর থাকেন। পরীক্ষাকারীগণ এমন সুচারুরূপে পরীক্ষার কাজ সুসম্পন্ন করেন যাতে কোনরূপ ভুলত্রুটি না থাকে। নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে ছাপানো কুরআন শরীফগুলো আলাদাভাবে মোহরাঙ্কিত (সীল) করা হয়।

নয়. পরীক্ষাকারীগণ কুরআন শরীফের যে সমস্ত কপি নিখুঁত ও নির্ভুল বলে শনাক্ত করেন সে সব হতে নমুনা স্বরূপ কিছু কপি নিয়ন্ত্রক কমিটি গ্রহণ করেন এবং সে সবের নির্ভুলতা পুনঃপরীক্ষা করে দেখেন।

দশ. এভাবে ধাপে ধাপে যাচাইয়ের কাজ শেষ হলে প্রতিটি মুদ্রণের বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। তাতে স্বীকৃত ও গৃহীত কপিগুলোর বিবরণ, কোন মন্তব্য থাকলে সে সব এবং মুদ্রণ ত্রুটিজনিত কারণে নষ্ট করে ফেলা কপিগুলোর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে।

অতএব আল্লাহ্‌র মহান কিতাবের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য যে ধরনের সতর্কতা অবলম্বন ও কষ্ট স্বীকার করা হয় আশা করি সবার কাছে তা অত্যন্ত গুরুত্ববহ হয়ে ওঠবে।

পবিত্র কুরআনের অর্থ ও অনুবাদ প্রকাশ

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের অর্থ ও অনুবাদ প্রকাশে এ প্রকল্প ব্যাপক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। তম্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে, হাউসা, চীনা, মালয়েশীয়, ইন্দোনেশীয়, কাযাক (রুশীয় হরফে) কাযাক (আরবী হরফে), তামিল, উর্দু, তুর্কী, ইংরেজী, বাংলা, ফরাসী, সোমালি, বসনীয়, জার্মান, উইঘুর (চীন) ও বারাহুই (চীন), থাই, পশ্‌তু, আলবেনি, আইভরিয়ান, স্পেনিশ, ফার্সী, কাশ্মীরী, কোরিয়ান, মালাবারি, মেসোডোনিয়ান, ইউরোবা গ্রীক, এ্যানকো, বার্মিজ ও জুলু (সাউথ আফ্রিকান) ভাষায়। Ref: - At the Service of Allah's Guests।[১৫৯]

এছাড়াও এখানে পাকিস্তানী নাস্তালিক লিপিতেও (বোম্বে ছাপা) কুরআন ছাপা হচ্ছে যা পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, বাংলাদেশ ও আরাকানে ব্যাপকভাবে পঠিত হয়।

১৪১০ হিজরী পর্যন্ত (১৯৯০ খৃঃ) এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০ মিলিয়ন (পাঁচ কোটি) কপি কুরআন
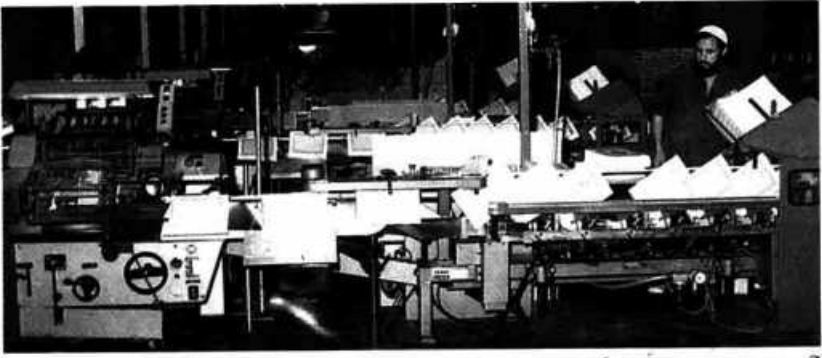
পবিত্র কুরআন শরীফ মুদ্রণ প্রকল্প প্রেসে কুরআনের কভার মুদ্রণ কার্য সম্পাদন করছেন একজন কর্মী

ছাপা হয়। ১৪১৫ হিজরীর (১৯৯৫ খৃঃ) মধ্যে এ সংখ্যা ৯৭ মিলিয়নে পৌছে।[১৬০] সকল সংস্করণের ৮০ মিলিয়ন (আট কোটি) কপি সারা পৃথিবীতে বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে এর বার্ষিক মুদ্রণ সংখ্যা ১২ মিলিয়নে (১ কোটি ২০ লক্ষ কপিতে) পৌছেছে। পবিত্র কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্সের যাবতীয় নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন হলে এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানের ৩ গুণ বৃদ্ধি পাবে। সে ক্ষেত্রে দৈনিক ৩ শিফ্‌ট-এ কর্মীদের কাজ করতে হবে। পৃথিবীর ৮০টি দেশের মানুষ কুরআন বিতরণের এ কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে।
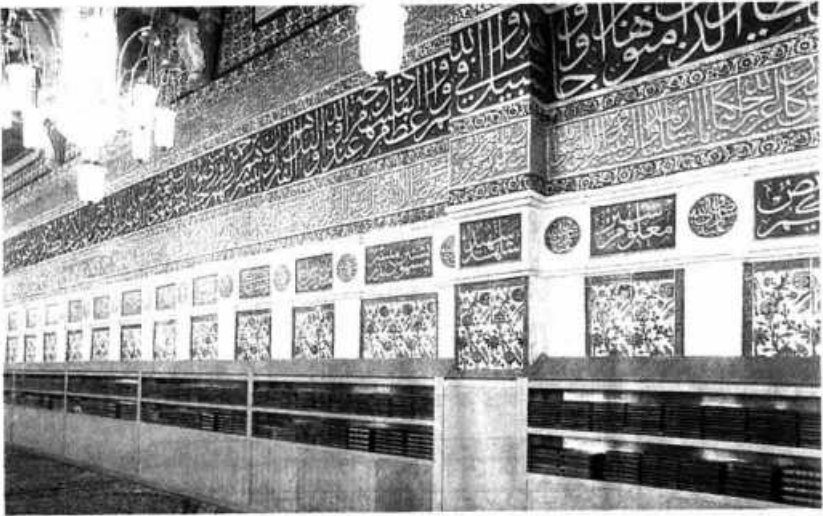
মসজিদে নববী (সাঃ) এর দক্ষিণ পার্শ্বের একটি দেয়াল

অধিকন্তু এ প্রকল্পের শুরু থেকে কুরআন শরীফের মুদ্রিত কপির সংখ্যা ১৫০ মিলিয়ন (পনের কোটি)। এগুলো বিভিন্ন আকার ও ডিজাইনের। প্রতিটি সংস্করণে নিপুণ ও নির্ভুলতার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। সে সব সংস্করণের মধ্যে রয়েছে ঃ

মালিকী ফাকীর, জাওয়ামী-ই-ফাকীর, জাওয়ামী-ই-খাস, জাওয়ামী-ই-আম, মুমতাজ এবং অনুবাদ। এ পর্যন্ত পবিত্র কালামের অর্থ ও অনুবাদের ৪০টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রকল্পের কর্মরত লোক সংখ্যা ১,৮০০ জন।

******

সূত্র ও টীকা-টিপ্পনী :

১. আরবী 'আমালিকাহ' শব্দ থেকে আমালিকা নামটি উদ্ভূত। এর অর্থ দৈত্য।
২. আল বুখারী (১৮৭২) এবং মুসলিম শরীফ (১৩৯৬)
৩. আত্-তাইয়্যেবা : যা উত্তম ও বিশুদ্ধ
৪. শির্‌ক : বহু ঈশ্বরবাদ : এক আল্লাহ্‌র সাথে অংশী স্থাপন করা।
৫. সহিহাইন : হযরত ইমাম বুখারী (রাঃ) ও হযরত ইমাম মুসলিম (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত হাদিস শরীফের বিশুদ্ধ সংকলন।
৬. আল বুখারি (৩৬২২) এবং মুসলিম (২২৭২)
৭. তিরমিজি (৩১৩৯) ও আহমদ (২২৩/১)
৮-৯. পরিমাপ (চার মুষ্টি ও দু'মুষ্টি পরিমাণ)
১০. আল বুখারী (১৮৮৯) ও মুসলিম (১৩৭৬)
১১. আল বুখারী (১৮৮৫) ও মুসলিম (১৩৬৯)
১২. আল বুখারী (২১২৯) ও মুসলিম (১৩৬০)
১৩. আল বায্‌যার কর্তৃক মুসনাদের (১/২৪০) বর্ণনা মতে। হাদিসটি হাসান।
১৪. খলীল : বন্ধু।
১৫. মুসলিম (১৩৭৩)
১৬. বুখারী (১৮৭৬) ও মুসলিম (১৪৭)
১৭. যাঁরা সাহাবীদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন।
১৮. বুখারী (১৮৮৩) ও মুসলিম (১৩৮৩)
১৯. মুসলিম (১৩৮১)
২০. মুসলিম (১৩৮৪)
২১. মুসলিম (১৩৮১)
২২. মুসলিম (১৩৬৩)
২৩. মুসলিম (১৩৭৪)
২৪. আহমদ (৭৪/২) তিরমিজি (৩৯১৭)
২৫. আয়িশা বিনতে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)
২৬. মাজমাউজ জাওয়ায়েদ (৩/৩০৬) আল হাইতামী বলেন : "এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।"
২৭. মুসলিম (১৩৬৩)
২৮-২৯. ক্ষতিপূরণ
৩০. আল কুবরা আন নাসাঈ (৪২৬৫) আস সহিয়াহ (২৩০৪)
৩১. আহমদ (৩/৩৫৪)
৩২. ইবনে আবি সাবিয়াহ (৬/৪০৯)
৩৩. বুখারী (১৮৮০) ও মুসলিম (১৩৭৯)
৩৪. বুখারী (১৮৮১) ও মুসলিম (২৯৪৩)
৩৫. বুখারী (৭১২৫, ৭১২৬)
৩৬. বুখারী (১৮৮৮) ও মুসলিম (১৩৯০, ১৩৯১)
৩৭. বুখারী (১৮৮৯) ও মুসলিম (১৩৭৬)
৩৮. দায়লামী - আল ফিরদাউস (৬৯৫৩)
৩৯. বুখারী (১৮০২)
৪০. বুখারী (২১২৯) ও মুসলিম (১৩৬০)
৪১. বুখারী (১৮৭০) ও মুসলিম (১৩৬০)
৪২. বুখারী (১৮৭৩) ও মুসলিম (১৩৭২)
৪৩. হারাম– অলংঘনীয় এলাকা, অমুসলিমদের জন্য প্রবেশ ও বসবাস নিষিদ্ধ এলাকা।
৪৪. আদ দুররুস শামীন কৃত আশ শানকিতি (পৃঃ ১৭-১৬)
৪৫. আবু দাউদ (২০৩৫)

৪৬. আবু দাউদ (২০৩৯)
৪৭. ইবনে উশাইমিন তাঁর ইখতিয়ারাত এ বলেন ঃ "সঠিক মত এই যে, মদীনার হারাম শরীফে শিকার নিষিদ্ধ।" শিকারের কাফফারা সম্পর্কে অবশ্য তিনি বলেন, "সঠিক মত এই যে, মদীনায় শিকারের কোন কাফফারা নির্ধারিত হয়নি। তবে চাইলে নিষিদ্ধ শিকারের বিধান লংঘনকারী থেকে শিকার লব্ধ বস্তু কেড়ে নিয়ে কিংবা অর্থদণ্ড দিয়ে বিচারক তাকে শাস্তি দিতে পারেন। এ বিষয়ে কোন আপত্তি নেই। আগ্রহী পাঠক ইবনে উশাইমিন বিরচিত ইখতিয়ারাত গ্রন্থ পড়ে দেখতে পারেন (পৃঃ ২৪৪)।
৪৮. আদ দুররুস শামীন কৃত আশ শানকিতি (পৃঃ ২৫২-২৫৩)
৪৯. দেখুন মুজামুল বুলদান (৪/১৯৪ মার্জিনে মন্তব্য)
৫০. ইসলাম প্রচারের পূর্ববর্তী অজ্ঞানতার যুগ।
৫১. আদ দুররুস শামীন কৃত আশ শানকিতি (পৃঃ ২০০-২০০১)
৫২. মদীনার অধিবাসী যাঁরা মক্কা হতে আগত মুহাজিরদের সাহায্য করেছিলেন।
৫৩. তারিখ আত তাবারী (২/২৪৫-২৪৬)
৫৪. তারিখ আত তাবারী (২/২৪৬)
৫৫. বুখারী ও মুসলিম
৫৬. কোরআনের শিক্ষক
৫৭. বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (৪/৩৯৬-৩৯৮)
৫৮. বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (৪/১০৪, ৪০২)
৫৯. তিরমিজি (৩১৩৯) ও আহমদ (১/২২৩)
৬০. দার-উন-নদওয়া : (মক্কার কোরেশ সর্দারদের) সমাবেশ স্থল।
৬২. সে আনসারদের বুঝিয়েছিল। কারণ এ নামের মহিলার গর্ভ থেকে তাদের বংশ বিস্তার ঘটেছিল।
৬৩. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (৪/৪৮৬)
৬৪. বুখারী (৩৯২৫)
৬৫. মুসলিম (২০০৯)
৬৬. আহমদ
৬৭. উহুদের মাঠে কা'ব বিন মালিক (রাঃ) আহত হয়েছিলেন।
৬৮. তফসীরে ইবনে কাসির। সূরা আল আহযাব আয়াত ৬। ইবনে আবি হাতিম বর্ণিত হাসান হাদিস।
৬৯. বুখারী (২০৪৯) ও মুসলিম (১৪২৭)
৭০. আহমদ (৩/২০৪)
৭১. বুখারী (৩৯০৯) ও মুসলিম (২১৪৬)
৭২. বুখারী (৩৯১০) ও মুসলিম (২১৪৮)
৭৩. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (৪/৫৭৩, ৫৭৪)
৭৪. তিরমিজি (১৮৯)
৭৫. শাম : বর্তমান যুগের সিরিয়া, জর্দান, লেবানন এবং ফিলিস্তিন।
৭৬. দেখুন আবদুল বাসিত বদর রচিত পুস্তক আত তারিখ আশ শামিন লিল-মদীনাতিল মুনাওয়ারা। (পৃ: ১৬৫-১৬৬)
৭৭. আর রাহীকুল মখতুম (পৃ: ২৮২)
৭৮. আর রাহীকুল মাখতুম (পৃ: ৩৫৩)
৭৯. আর রাহীকুল মাখতুম (পৃ: ৩৮০)
৮০. কবিতার পংক্তি
৮১. বুখারী (৩৯০৬)
৮২. বুখারী (৪৪৬)
৮৩. আহমদ (২/১৩০) ও আবু দাউদ (৪৫১)
৮৪. ২৪ হিজরীতে তাঁকে অনুরোধ করা হলেও ২৯ হিজরীর পূর্বে তিনি মসজিদ সংস্কার করেন নি।
৮৫. ওয়াফা আল ওয়াফা (২/৫০২)
৮৬. ওয়াফা আল ওয়াফা (২/৫১৩-৫২৬)
৮৭. আদ-দুররাতুত শামিনাহ কৃত ইবনে আন নাজ্জার (পৃ: ১৭৮-১৭৯)

৮৮. তারিখে আল মসজিদ আন নববী আশ শরীফ (পৃ: ৫১-৫২)
৮৯. ড. মুহম্মদ ইলিয়াছ আবদুল গণি কৃত তারিখ আল মসজিদ আল-নববী আশ শরীফ (পৃ: ৬৫-৬৮)
৯০. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আবদুল গণি কৃত তারিখ আল মসজিদ আন নববী আশ শরীফ (পৃ: ৭৩-৭৫)
৯১. বুখারী (৩৫৮৪)
৯২. ফতহুল বারী ৩৫৮৫ নং হাদিসের ব্যাখায়
৯৩. ওয়াফা আল ওয়াফা (২/৩৮৮-৩৯০)
৯৪. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আবদুল গণি কৃত তারিখ আল মসজিদ আন নববী আশ শরীফ (পৃ: ১১৯-১২০)
৯৫. হাউজ : আল কাউসার (দেখুন : সূরা আল কাউসার ১০৮:১)
৯৬. বুখারী (১৮৮৮) ও মুসলিম (১৩৯১)
৯৭. বর্ণনার ধারাবাহিকতা
৯৮. আবু দাউদ (৩২৪৬)
৯৯. বায়তুল মুকাদ্দিস : জেরুজালেম
১০০. আর রওয়াজায় অবস্থিত
১০১. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আবদুল গণি বিরচিত তারিখ আল মসজিদ আন নববী আশ শরীফ (পৃ: ১০৪-১০৫)
১০২. আখবার মদিনাতুর রসুল (পৃ: ৭৯)
১০৩. এ আয়াত সম্পর্কে ইবনে কাসির বলেন : ধর্ম পরায়ণদের মধ্যে পূর্ববর্তী একটি দল কু'বা মসজিদকে এ আয়াতের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ হাদিসের বর্ণনা মতে এ আয়াত দ্বারা মসজিদে নববীই উদ্দেশ্য যা মদীনা শরীফের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এটিই সে মসজিদ যা শুরু থেকে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং এ মতই সঠিক ... ইমাম আহমদ তাঁর মসনদে বলেন রসুল (সাঃ) বলেছেন : তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি আমারই মসজিদ।" ইমাম আহমদের আর এক বর্ণনায় আছে : রসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াতে যে মসজিদের উল্লেখ করা হয়েছে তা আমারই মসজিদ। ইবনে জরীর আত-তাবারীর অভিমতও তাই। অবশ্য শেখ মুহাম্মদ নাসির আদ দ্বীন আল আলবানী তাঁর আসসামার আল মুস্তাতাব কিতাবে বলেন : এখানে কু'বা মসজিদের কথাই বলা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন এর প্রমাণ হচ্ছে পূর্ববর্তী আয়াতে কু'বা মসজিদের কাছাকাছি স্থানে নির্মিত মুনাফিকদের মসজিদের প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি বলেন ১০৮ নং আয়াতটি ১০৭ নং আয়াতের প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে। এবং আল্লাহই সমধিক ভাল জানেন।
১০৪. বুখারী (১১৯০) ও মুসলিম (১৩৯৪)
১০৫. মাজমাউজ জাওয়ায়েদ (৪/৭)
১০৬. তারিখ আল মসজিদ আন নববী আশ শরীফ (পৃ: ১১)
১০৮. তারিখ আল মসজিদ আন নববী আশ শরীফ কৃত ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আবদুল গণি (পৃ: ১২-১৩)
১০৯. বুখারী (৮৫৫) ও মুসলিম (৫৬৪)
১১০. বুখারী (১১৮৯) ও মুসলিম (১৩৯৭)
১১১. সহিহ ইবনে হিব্বান (৪/৪০৫=১৬২২)
১১২. মুজাহিদ- যে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে।
১১৩. ইবনে মাজাহ (২২৭) আল আলবানী কর্তৃক প্রত্যায়নকৃত।
১১৪. মাজমাউজ জাওয়াইদ (১/১২৩)
১১৫. মাহরম মানে যাকে বিবাহ করা যায় না যেমন পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, খালা, ফুফু, ভাইপো-ভাইঝি, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ইত্যাদি।
১১৬. বুখারী (১১৮৯) ও মুসলিম (১৩৯৭)
১১৭. কু'বা মদীনা শরীফের কাছে একটি পল্লীর নাম। বর্তমানে মদীনার অন্যতম জেলা।
১১৮. আল মসজিদ আল আসারিয়া (পৃষ্ঠা : ২৭)
১১৯. বুখারী (১১৯৩) মুসলিম (৩৯৯)
১২০. আল হাকীম রচিত আল মুসতাদরাক (৩/১১)
১২১. ঐ
১২২. আদদুররুস সামীন (পৃষ্ঠা: ১২১)
১২৩. মুসলিম-২৮৯০
১২৪. আল মসজিদ আল আসারিয়া (৩৩-৩৪)

১২৫. ঐ (৬৪-৬৭)
১২৬. আদ দুররুস আস সামীন
১২৭. আল-বুখারী (৩৯৯)
১২৮. কাবার দিকে একটি নর্দমার ড্রেইনপাইপ ছিল।
১২৯. আল মসজিদ আল আসারিয়া।
১৩০. সাইয়েদুস শোহাদা : শহীদদের নেতা, হযরত হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব, নবীজীর আপন চাচা।
১৩১. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আবদুল গণি কৃত আল মসজিদ আল আসারিয়া (পৃ: ২০৪-২০৫)
১৩২. ড. মুহাম্মদ ইলিয়াছ আবদুল গণি কৃত আল মসজিদ আল আসারিয়া (পৃ: ২০১)
১৩৩. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ (৪/১২), ইমাম আহমদ কৃত মুসনাদ (৩/৩৩২)
১৩৪. আল মসজিদ আল আসারিয়া (পৃ: ১৩৯-১৪০)
১৩৫. ঐ (পৃ: ২৫৫)
১৩৬. যেখান থেকে হজ্ব ও ওমরার ইহরাম বাঁধতে হয়।
১৩৭. বুখারী (১৫৩৩) মুসলিম (১২৫৭)
১৩৮. ওয়াফা আল ওয়াফা (৩/১০০২) আল মসজিদ আল আসারিয়া (পৃ: ২৫৬)
১৩৯. আল মসজিদ আল আসারিয়া (পৃ: ২৬০)
১৪০. বুখারী (১০২৭) ও মুসলিম (৮৯৪)
১৪১. আবিসিনিয়ার (বর্তমান ইথিয়োপিয়ার) বাদশাহ নাজ্জাসী। কুরাইশদের অত্যাচারে নির্যাতিত মুসলমানদের মধ্য থেকে নবুয়তের ৫ম বর্ষে হিজরতকারী ১ম দলকে তিনি উষ্ণ আতিথেয়তাসহ আশ্রয় দিয়েছিলেন।
১৪২. অনুপস্থিত লাশের জন্য জানাযা।
১৪৩. বুখারী (১২৪৫) ও মুসলিম (৯৫১)
১৪৪. আল মসজিদ আল আসারিয়া (পৃ: ২৩২-২৩৪)
১৪৫. আল মসজিদ আল আসারিয়া (পৃ: ১৫৫)
১৪৬. বুখারী (২৮৮৯), মুসলিম (১৩৬৫)
১৪৭. বুখারী (৩৬৭৫)
১৪৮. মুজামুস বুলদান (১/১৩৫)
১৪৯. বুখারী (৪০৪২)
১৫০. আদ দুররুস শামীন (পৃ: ১১০)
১৫১. মুসলিম (৯৭৪) ও ইবনে হিব্বান (৩১৭২)
১৫২. মুসলিম (৯৭৪) ও আন নাসাঈ (২০৩৯)
১৫৩. তিরমিজি (৩৬৯২) আল হাকিম (২/৪৬৫)
১৫৪. বায়তুস সাহাবাহ (পৃ: ১৬৯)
১৫৫. আত্ তা'লীমুল আ'লী - সৌদী তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত (পৃ: ৩৭-৪১)
১৫৬. দার আল মামলাকাহ আল আরাবিয়া আস সউদীয়া ফি খিদমাতিল ইসলাম।
১৫৭. দার আল মামলাকাহ আল আরাবিয়া আস সউদীয়া ফি খিদমাতিল ইসলাম।
১৫৮. মাজাল্লা মক্তবা আল মালিক ফাহাদ আল ওয়াতানিয়া প্রথম সংখ্যা মুহাররম জমাদিয়াল আখিরাহ ১৪১৭ হি: (পৃ: ৬৭-৬৯)
১৫৯. হিব্রু ভাষায় কুরআনের অর্থ ও অনুবাদ করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা ইসরাইলী সরকার হিব্রু ভাষায় কুরআনের এমন এক অনুবাদ ছেপেছে যা ভ্রমাত্মক ও ইসলামের প্রতি মিথ্যা অভিযোগে পূর্ণ।
১৬০. ১৪২২ হি: (২০০০ খৃ:) এ সংখ্যা ১৩৮ মিলিয়নে পৌঁছেছে।

✪ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ 'পবিত্র মদীনার সচিত্র ইতিহাস'-এ সন্নিবেশিত বিবিধতথ্য এবং চিত্রগুলো নিম্নোক্ত গ্রন্থ হতে সংগৃহীত

1. History of Madinah Munawwarah-Darussalam, Riyadh, K.S.A.
2. History of Madinah Munawwarah-Al-Rasheed Printers, Madinah-K.S.A
3. Memories of the Luminous City-Red Design Co. Cairo, Egypt.
4. At the Service of Allah's Guests-Ministry of Culture and Information Affairs, Riyadh, K.S.A.
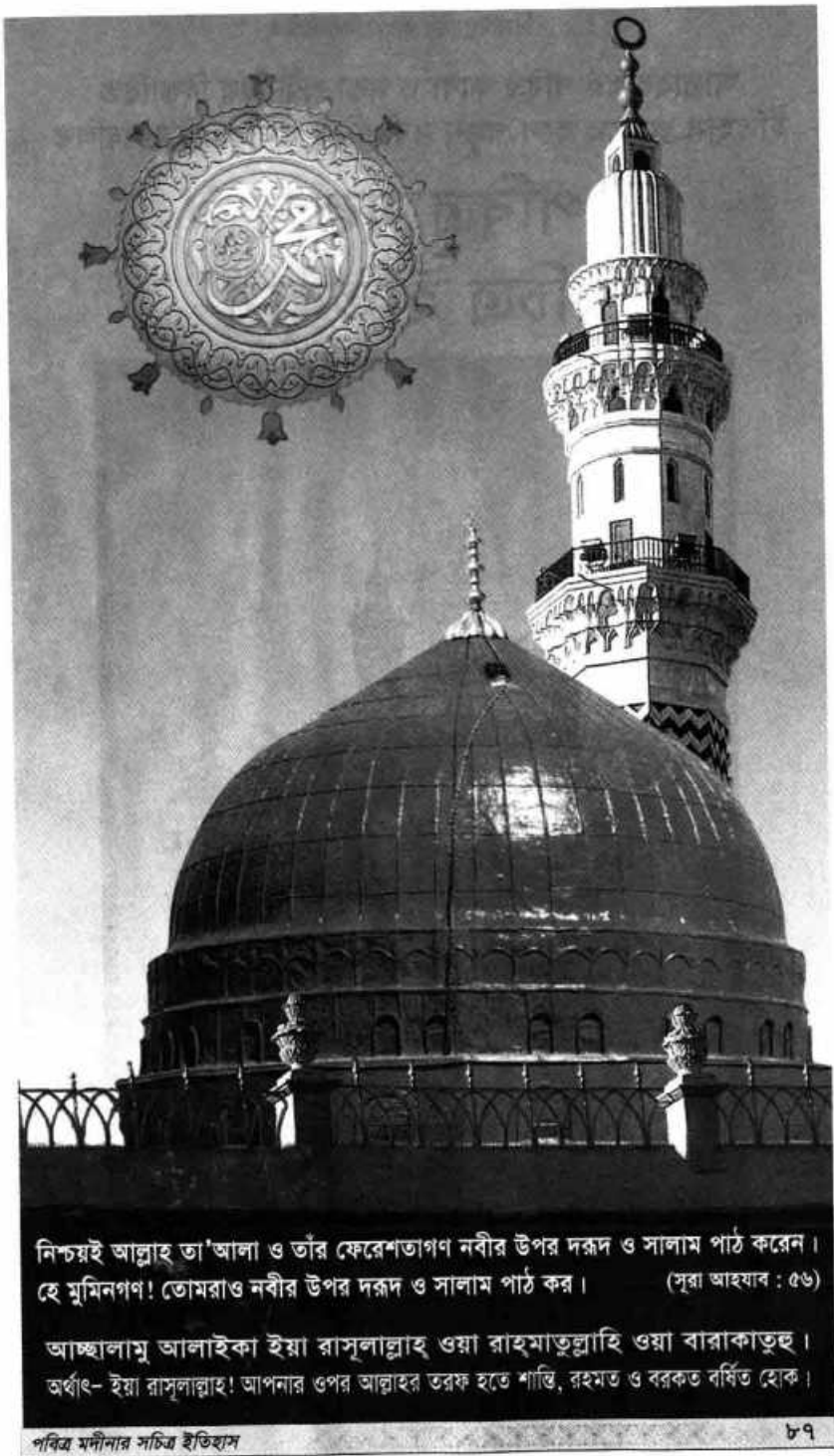
নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করেন।
হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ কর।
(সূরা আহযাব : ৫৬)
আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
অর্থাৎ- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ওপর আল্লাহর তরফ হতে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।